সম্পাদকীয়–

আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করতে চাইলে যুগ মসীহকে মান্য করুন

বর্তমানে সারাবিশ্বে চরম অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে নানান বিপদাপদ, বেড়ে গেছে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। দেশে দেশে সংঘটিত হচ্ছে ভয়ানক সব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। এক কথায় বলা যায় বিশ্ব যেন ধ্বংসের দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে। এ থেকে মুক্তির কোন কৌশলই যেন আজ কাজে আসছে না। বিরাজমান এ দুরাবস্থা থেকে মুক্তির পথ একটাই মাত্র খোলা আর তা হলো আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। মহান খোদার অশেষ কৃপা ছাড়া বর্তমান এই নাজুক পরিস্থিতি থেকে বিশ্ব কোন মতেই উদ্ধার পেতে পারে না।

আহমদীয়া জামাআতের যুগ খলীফা সম্প্রতি তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন, একান্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে, মুসলমানরা মহানবী (সা.)কে মেনে একবার খোদার ফযল লাভ করা সত্ত্বেও এখন যুগ ইমামকে অস্বীকার করে পুনরায় খোদার দৃষ্টিতে ক্রোধভাজন হচ্ছে। মুসলমানদের অবস্থা দৃষ্টে এটিই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, খোদা তাআলা তাদের প্রতি রুষ্ট। উম্মতে মুসলেমার এই দুরাবস্থা থেকে মুক্তির পথ আজ একটিই আর তা হলো– যুগ ইমামকে মানা এবং তাঁর আনুগত্যের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে নিজেদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার উদ্যোগ নেয়া। তিনি (আই.) আরও বলেন, সত্য কথা হলো, মুসলমান আলেমরা যদি আজ যুগ ইমামকে মানে তাহলে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে, তাদের রুটি-রুজি বন্ধ হবে তাই এরা সত্য জেনেও তা অস্বীকার করছে। অপরদিকে এরাই আবার খিলাফতের প্রয়োজনীয়তার বুলি আওড়ায়। কিন্তু তারা জানে না যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আবির্ভাব ছাড়া কোনক্রমেই খিলাফত প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। সত্য হলো– এরা কুরআন জানে না। আর জানবে কি করে? যারা সত্যিকার অর্থে মনোনীত আর খোদার প্রতি অনুগত তাঁরাই কুরআনের পবিত্র রহস্যাবলী অনুধাবন করতে পারে অন্যেরা নয়। এ যুগে খোদার প্রেরিত যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের রহস্য বুঝিয়েছেন এবং কুরআনের সত্যিকার শিক্ষা অবহিত হয়ে আমাদেরকে তিনি (আ.) তা বুঝিয়েছেন আর কুরআনের শিক্ষাদাতা রূপে এখন তিনিই আদিষ্ট।

আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে আমরা হযরত রসূল করীম (সা.) এর আদেশ মেনে মুহাম্মদী মসীহ (আ.)কে গ্রহণ করার তৌফিক পেয়েছি এবং যুগ খলীফার দয়ার চাদরে আশ্রয় নিয়েছি। আর এজন্য আমাদের বেশি বেশি দোয়া করা প্রয়োজন। খোদা যেন আমাদেরকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত খিলাফতের আনুগত্যের ছায়ায় থেকে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করেন। সেই সাথে আজও যারা প্রতিশ্রুত সত্য মসীহকে না মানার ফলে নানা বিপদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে তারাও যেন সত্বর যুগ মসীহকে মেনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

১৫ ডিসেম্বর ২০০৮

সূচী পত্র — *পৃষ্ঠা নং*

- **কুরআন শরীফ** ৪
- **হাদীস শরীফ** ৫
- **অমৃত বাণী** ৬
- ***জুমুআর খুতবা ঃ*** ৭-১৫
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- **সালামের গুরুত্ব ও কল্যাণ** ১৬-১৭
  সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী
- **প্রসঙ্গ ঃ দোয়া** ১৮-১৯
  কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী
- **খিলাফতের মহান উদ্দেশ্য** ২০-২২
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- **ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার জন্য ভ্রমণ** ২৩-২৭
  মাকসুদা রহমান
- **ধর্মপরায়ণা এক নারী– সৈয়দা আজিজাতুননেসা** ২৮-৩৩
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- **সংবাদ** ৩৪-৩৬
- **কৃষি পাতা** ৩৬-৩৮

প্রচ্ছদ : তারেক আহমদ (সবুজ)

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর

মহান ডিসেম্বর মাস আমাদের জাতীয় জীবনে অনন্য গৌরবের এক মাস। দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রাম এবং দেশের অকুতোভয় সন্তানদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বদেশ 'বাংলাদেশ'। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্রতিষ্ঠা পায় আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা।

৫৫ হাজার বর্গ মাইলের সবুজ শস্যশ্যামল এই ভূমিতে আজ থেকে ৩৭ বছর আগে উদীয়মান সেই সূর্যের আলোকচ্ছটায় ছিল নতুন দিনের স্বপ্ন, যার জন্য সইতে হয়েছে অত্যাচার-নিপীড়ন এবং আলিঙ্গন করতে হয়েছে মৃত্যুকে। এদেশের বিজয় আমরা অর্জন করেছিলাম অন্যায় অত্যাচারী পৈশাচিক শক্তিকে পরাভূত করে।

বিজয়ের এই শুভ মাসে, আমরা আমাদের সেই শুভদিনের প্রত্যাশা করছি যে দিনে পার্থিব ও জাগতিক সব অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ণ দূরীভূত হয়ে অনাবিল সুখ-শান্তিতে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠবে গোটা জগৎ–মানবাত্মা তার কাঙ্ক্ষিত পরম সুখের উদ্যানে বিচরণ করবে।

শুভ সেই কামনায় আমরা পাঠক -পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং শুভানুধ্যায়ী সহ বিশ্বের আপামর মুক্তিকামী মানুষকে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও বিজয় অভিনন্দন।

কুরআন শরীফ
সূরা হুদ-১১

২০। (এরা হলো সেসব লোক) যারা আল্লাহ্‌র পথে (লোকদের) বাধা দেয় এবং এটাকে বক্র (করতে) চায় এবং এরাই হলো পরকালে অস্বীকারকারী

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এরা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা) কখনো ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এদের কোন বন্ধু হবে না। এদের শাস্তি বাড়িয়ে দেয়া হবে[১৩০৬]। এরা শুনার সামর্থ্য রাখবে না এবং দেখতেও পাবে না।

أُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ
لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ
الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا
يُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। এরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং এরা যা মিথ্যা বানিয়ে বলতো তা এদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا
كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। নিঃসন্দেহে পরকালে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি বিনত হয়েছে[১৩০৭] এরাই জান্নাতবাসী। এরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى
رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। এ দু'দলের দৃষ্টান্ত অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণক্ষম ব্যক্তির মত[১৩০৮]। দৃষ্টান্তের দিক দিয়ে এ দু'দল কি সমান? তবে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَ
السَّمِيْعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾

১৩০৬। "তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে," অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের নেতাগণের নিজেদের পাপের এবং যাদেরকে তারা সত্যের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করেছিল তাদের উভয় অপরাধের শাস্তি মিলে দ্বিগুণে পরিণত হবে।

১৩০৭। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে উচ্চতর মোকাম বা মর্যাদা লাভ করতে হলে, সঠিক বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ একীন, সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ, দৃঢ় আস্থা এবং অকৃত্রিম প্রেম থাকতে হবে।

১৩০৮। এই আয়াতে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যে যে বৈপরীত্য রয়েছে তা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হয়েছে। একজন বিশ্বাসীকে পূর্ণ চক্ষুষ্মান এবং শ্রবণক্ষম ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, অপরদিকে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে অন্ধ ও বধির ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

হাদীস শরীফ
প্রতারণা

কুরআন ঃ

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে (সূরা আর রা'দ ঃ ১২)

হাদীসঃ

আন আবী হুরায়রাতা ক্বলা আন্না রসূলাল্লাহি (সা.) ক্বলা ইযা ক্বলার রসূলু হালাকান্নাসু ফাহুআ আহলাকাহুম (মুসলিম)।

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি অন্যদের সম্বন্ধে বলে, সে (বা তারা) ধ্বংস হয়ে গেল বস্তুতঃ সে ব্যক্তি এই কথা বলে তাকে (তাদেরকে) ধ্বংস করে দেয়। (অথবা লামের ওপর পেশ দ্বারা পড়লে হবে সে নিজেই তার চাইতে বেশী ধ্বংস-প্রাপ্ত)।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার কথা বর্ণনা করে উত্তম জাতিতে পরিণত হবার পদ্ধতি বর্ণনা করছে। মানুষের মধ্যে উন্নতির জন্য সব কিছু রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ তার সঠিক ব্যবহার করে না। কেউ অহংকার অহমিকায় ভোগে, তো কেউ হীনমন্যতায়। বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে যা অনেকের মাঝে মিথ্যা অহংরূপে নিহিত থাকে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে তা হলো, জাতির মাঝে, লোকদের মাঝে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও সৎ সাহসের সঞ্চার করতে হবে তবেই জাতি বা গোষ্ঠী উন্নতি করবে। এর পরিবর্তে যদি চেষ্টা না করে অত্যন্ত হতাশার বহির্প্রকাশ করে বলতে থাকে যে, ধ্বংস হয়ে গেল– আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, এভাবে বললে, তারা নিরুৎসাহিত হবে, হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করবে। হযরত রসূল করীম (সা.) একবার এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা সেখান থেকে পরাস্ত হয়ে মদীনায় ফেরত আসলেন। ইসলামে পলায়ন করা হারাম আর 'আমরা পলায়ন করেছি' এই ভেবে তারা লজ্জায় ও শরমে হুযূর (সা.)-এর সামনে আসতেন না। এক সময় হুযূর (সা.) তাদের মসজিদের এক কোণায় মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে দেখলেন। হুযূর (সা.) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা লজ্জায় মাথা নীচু করে বল্লেন, আমরা পলায়নকারী। তিনি (সা.) তাদের অবস্থা আঁচ করে বল্লেন, তোমরা পলায়নকারী নও। তোমরা শক্তি অর্জন করে আক্রমণের জন্য পিছিয়ে এসেছো। তোমরা অন্য কারো কাছে যাওনি বরং আমার কাছে এসেছো। আমি তোমাদের নেতা হয়ে আবার তোমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাবো।

সুবহানাল্লাহ্, কতই না উত্তম আচরণ ও কতই না উত্তম শিক্ষা! তিনি (সা.) সাহাবাদের মনের অবস্থা আঁচ করে কত সুন্দর মন্তব্য করলেন। আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো আমরা কীভাবে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হচ্ছি, কীভাবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত করছি।

কুরআন এবং হাদীস বলে, এরূপ ব্যধিগ্রস্তগণ কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না বরং ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সর্বদা সতেজ মনের অধিকারী হই। মৃত্যুর আগেই যেন মনের দিক হতে মৃত্যুবরণ না করি, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ
আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

...আমার ব্যাপারে যদি তোমার সন্দেহ থাকে আর আমার পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি তোমার চোখে না পড়ে এবং তুমি যদি এ ধারণা কর যে, ফিতনার সর্বগ্রাসী অগ্নি নির্বাপণের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ বণী ফাতেমার বংশ থেকে আসবেন, অন্য জাতির মধ্য থেকে নয়, তাহলে জেনে রেখো, এটি ভিত্তিহীন একটি ধারণা আর ফলাবিহীন একটি তীর। এ বিষয়ে যে মতভেদ রয়েছে তত্ত্বজ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মুহাদ্দেসগণের এটি অজানা নয়। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, নিদর্শনের মদদপুষ্ট মাহ্দী হবেন আব্বাসের বংশোদ্ভুত। আর কোন কোন রেওয়ায়াতে লেখা আছে, **আল লাহ মিন্না** অর্থাৎ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের বংশোদ্ভুত হবেন। আর কোন কোন বর্ণনানুযায়ী তিনি হাসান হোসাইনের বংশধর হবেন। সুতরাং এ বিষয়ে মতভিন্নতা দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের কাছে অজানা কোন বিষয় নয়। এ ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, **সালমানু মিন্না আহলিল বাইতে** [অর্থাৎ সালমান (রা.) আমাদেরই একজন এবং তিনি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত] অথচ তিনি বাহ্যত: আহলে বাইতভুক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন পারস্যবাসীদের একজন। তোমার স্মরণ থাকা উচিত, জাতিগোষ্ঠীর বিষয়টি এমন যার স্বরূপ সর্বজ্ঞানী খোদা ছাড়া আর কেউ জানে না। এছাড়া হযরত ফাতেমা সম্পর্কে আমি যে স্বপ্নের কথা লিখেছি, তা হযরত ফাতেমার সাথে আমার গভীর সংশ্লিষ্টতার সাক্ষ্য বহন করে। আল্লাহ্ তাআলাই সব কিছুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত। কিতাবুত্ তাইসীরে হযরত আবূ হুরায়রার পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীদের মধ্য থেকে যে-ই ইসলাম গ্রহণ করে সেই কোরাইশী। আর আমার প্রভুর দেয়া সংবাদ অনুসারে আমি পারস্য বংশীয়। সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তা কর আর বিদ্বেষীদের ন্যায় তড়িঘড়ি কিছু করে বসো না। এছাড়া পরিষ্কার নীতি ও সবচেয়ে দৃঢ় পন্থা হলো, লক্ষণাবলী বিশ্লেষণ করা এবং সুস্পষ্ট কথাকে সন্দেহযুক্ত বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেয়া। তুমি যদি এ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে চাও তাহলে তোমাকে যুক্তির আলোকে চিন্তা করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাকে সুস্পষ্ট সত্যের পানে পরিচালিত করুন। বিষয়টি হলো, কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত নির্ভরযোগ্য হাদীসও এ বিষয়ে একমত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা ও রহমতের নিদর্শনস্বরূপ এ উম্মতের যুগকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। আর সব আলেম নিঃসন্দেহে এটা স্বীকার করবেন। প্রথম যুগ হলো প্রথম তিন শতাব্দীর প্রথমাংশ অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর যুগের প্রথম ভাগ। আর দ্বিতীয় যুগ হলো বিদা'তের সূচনা থেকে আরম্ভ করে সে সময় পর্যন্ত যখন বিদা'ত অনেক বিস্তৃত হয়েছে। আর তৃতীয় যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের যুগের সাথে সদৃশপূর্ণ যুগ যা পুনরায় নবুওয়তের যুগে ফিরে এসেছে এবং যা ঘৃণ্য বিদা'ত ও বিকৃত রীতিনীতি থেকে মুক্ত হয়ে খাতামান্ নবীঈনের যুগসদৃশ হয়েছে। বিশ্ব-রসূল (সা.) একে শেষ যুগ আখ্যায়িত করেছেন, কেননা এটি দু'যুগের শেষ যুগ। আল্লাহ্ আখেরী যুগের লোকদের সেভাবে প্রশংসা করেছেন যেভাবে প্রথম যুগের লোকদের প্রশংসা করেছেন।

[পুস্তক : 'সিররুল খিলাফাহ্' বাংলা সংস্করণ পৃ: ৭৮-৭৯]

সাধকের সার্থক মর্যাদা ধারণ করে এক দরবেশী জীবন যাপনকারী মরহুম হযরত সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব এর মধুময় স্মৃতিচারণ

তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনি, সেবা, ত্যাগ-তিতিক্ষা আর প্রশংসনীয় গুনাবলী উল্লেখ করে জামাতকে মূল্যবান উপদেশ প্রদান

নিষ্ঠাবান প্রত্যেক আহমদী, তিনি কাদীয়ানেই বাস করুন বা ভারতের অন্য কোন জামা'তে অথবা যেখানেই থাকুন না কেন, প্রত্যেক কর্মকর্তা ও হযরত মসীহ মাউদ (আ.) এর খানদানের প্রতিটি সদস্যের এরূপ আদর্শই স্থাপন করা উচিৎ

কাদীয়ানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী সেই মর্যাদাকে অনুধাবন করুন, যা মসীহ (আ.) এর আবাসস্থলে বসবাসকারীদের থাকা উচিৎ। ধর্মপরায়ন পূর্বসুরীরা বিদায় নিলে পর নব প্রজন্মের দায়িত্ব বেড়ে যায় আর জীবন্ত জাতীর নবীনেরা সেই দায়িত্ব সূচারুরূপে সম্পাদনের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে

বিশ্বের জামা'ত সমূহের উপরও কাদীয়ানের অধিকার রয়েছে যে, এ জনপদে বসবাসকারীদের জন্য প্রত্যেক আহমদী দোয়া করতে থাকবে, যাতে আল্লাহতা'লা মসীহ (আ.) এর জনপদের অধিকার সংরক্ষনকারী প্রজন্ম সর্বদা সৃষ্টি করতে থাকেন।

জুমুআর নামাযের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস আমীরুল মু'মেনীন (আইঃ) হযরত সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের গায়েবী জানাযা পড়ান।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ— بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ -

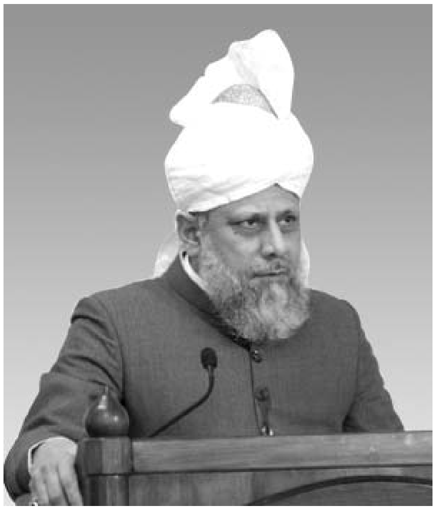

[সৈয়্যদেনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ৪ মে ২০০৭ মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডনে প্রদত্ত]

গত জুমুআয় আমি হযরত সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব মারাত্মক অসুস্থ থাকায় দোয়ার আবেদন করেছিলাম। এতে নিষ্ঠাবান কয়েকজনের পত্র এসেছে। বড়ই মর্মবেদনা নিয়ে লোকজন দোয়া করেছেন তবে আল্লাহ্‌তা'লার নিয়তিই জয়যুক্ত হয়েছে আর দু'দিন পর তিনি স্বীয় মহা প্রভুর সমীপে পৌঁছে গিয়েছেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।*

তাঁর সেবা, ত্যাগ এবং তাঁর গুণাবলী দৃষ্টিপটে রেখে কৃত দোয়া পরকালে অবশ্যই আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে, ইনশাআল্লাহ্। এরূপ নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগী এবং সংকটকালে সময়ানুগ উৎসর্গের প্রেরণায় সর্বদা কর্মসম্পাদনকারী, গরীবের সাহায্যকারী ও তাদের সহায়তাদানকারী, জামা'তের মর্যাদা অক্ষুন্নরূপে রক্ষাকারী এবং খিলাফতের জন্য নিবেদিত প্রাণ এ ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'লা সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করবেন বলে আমি আশা করি, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ তা'লা জান্নাতের সুউচ্চ স্থান প্রাপ্তদের মাঝে স্বীয় প্রিয়দের নৈকট্যে তাঁকে সমাসীন করুন। শোকবার্তা সম্বলিত অগণিত চিঠি-পত্র আসছে, শোক জ্ঞাপনের জন্য মানুষ আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসছেন, আল্লাহ্‌তা'লা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। এ পৃথিবীতে আসেন যিনি, এ ধরা তাকে ছেড়ে যেতেও হয়। এটি আল্লাহ্‌তা'লার অমোঘ বিধান, সর্বদা যা সচল আর এ বিশ্ব যদ্দিন থাকবে এভাবেই তা চলতে থাকবে। তবে সৌভাগ্যবান তারা, যারা খোদার সন্তুষ্টি অন্বেষণে এবং তাঁর

ধর্মের সেবায় জীবন যাপন করেন, আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্টির প্রতি তারা সহানূভুতি রাখে আর এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্তও স্থাপন করে। হযরত সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবও নিঃসন্দেহে এমন মহানুভবদেরই একজন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে জান্নাতের অনন্ত সৌভাগ্য দান করুন।

তাঁর মৃত্যুতে যেভাবে আমি বলেছি মানুষের নিকট থেকে শোকবার্তা সম্বলিত চিঠি-পত্র এখনো আসছে আর তাতে এটিও প্রকাশ পাচ্ছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর বংশের নিদর্শনমূলক একটি চিহ্ন যা কাদিয়ানের দারুল মসীহ্'তে অবস্থান করছিল তা এখন আর রইল না। এটি সঠিক যে, হযরত সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব কাদিয়ানের আহমদীদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক আর আহমদীয়া জামাত ভারতের সদস্যদের সাথে স্বভাবসূলভ এমন সম্পর্ক গড়েছিলেন যার কারনে লোকেরা নিরাপদ বোধ করতো এবং তাঁর কথাবার্তার মূল্যায়ণ করা হত এবং মর্যাদা দেয়া হত।

দীর্ঘ একটি সময় এমনও কেটেছে, যখন পাকিস্তান ও ভারতের মাঝে (বৈরী) সম্পর্কের কারণে কেন্দ্র বা সেই স্থানের সাথে যেখানে যুগ খলীফা অবস্থান করছিলেন, সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। পূর্বে এমন সময়ও এসেছে যখন আজকের মত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না আর যা-ও ছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, তবুও দরবেশগণ জামাত ও খিলাফতের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। এবং এতে তারা সান্তনা পেতেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর পৌত্র এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা:)-এর ছেলে তাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছেন আর সেই ছেলেও খিলাফতের প্রতি ভালবাসা, নেযামের প্রতি আনুগত্য ও আমীরের আনুগত্যের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপণ করে জামাতের সদস্যদের সর্বদা এই চেতনাবোধ জাগিয়েছেন আর এই চেতনা ও অনুভূতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যে, জামা'ত এবং খিলাফতই সবকিছু যার সাথে সম্পৃক্ত থেকে আমরা আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভকারী হতে পারি। ****

প্রায় ত্রিশ বছর তিনি হযরত মৌলভী আব্দুর রহমান জাট সাহেবের আমারত কালে একান্ত বিনয় ও বিশ্বস্ততার সাথে এক সাধারণ কর্মীরূপে বিশ্বস্ততা রক্ষার স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করে গেছেন। তারপর খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে:) ১৯৭৭ সনে তাঁকে যখন নাযেরে আলা ও আমীর মোকামী নিযুক্ত করলেন তখন সেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি খুবই সুন্দরভাবে সম্পাদন করেছেন। দরবেশ হিসেবে গিয়েছেন আর দরবেশের মতই জীবন-যাপন করেছেন। এ চিন্তা আসেনি যে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর পৌত্র; বরং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:) একদা তাঁর মর্যাদার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেন– (এ উপলক্ষটি হলো, যখন তিনি তাঁর বিয়ে উপলক্ষ্যে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন তখন বিয়ের মাত্র কিছুদিন হয়েছিল, স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ভারতে যাবার জন্য তার কাগজ-পত্র তৈরী করছিলেন। সে সময়ে যেমনটি করা হতো ছোট–খাট ব্যাপারে দু'দেশের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেতো। ইদানিং কিছু কাল ধরে তুলনামূলক ভাবে সম্পর্ক ভালো নতুবা এই টানাপোড়েন তো সর্বদাই চলে এসেছে)এমনই একটি মূহুর্তে যখন তিনি সেখানেই ছিলেন, বিয়ের মাত্র কয়েক দিন অতিবাহিত হয়; হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:)- অনুভব করলেন যে, অবস্থা মন্দের দিকে যাচ্ছে তখন তিনি (রা:) মিয়া সাহেবকে (নিজ ছেলেকে) বললেন, স্ত্রীর কাগজ-পত্র হতে থাকবে, তুমি তাকে রেখে দ্রুত ফিরে যাও কেননা তুমি যদি এখানেই থেকে যাও তাহলে তোমার না যাওয়ার কারণে মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর খান্দানের কোন সদস্য কাদিয়ানে আর থাকলনা। তাই দ্রুত প্লেনে টিকিট বুক করো (অবস্থার প্রেক্ষিতে সেইবার তিনি সড়ক পথে সীমানা পার হয়ে আসেন নি বরং অবস্থা এমন ছিল যে, প্লেনে আসতে হয়েছিল) আর তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। আর যদি প্লেনের টিকিট না পাও আর প্লেন ভাড়া করেও যেতে হয় তো তা-ই করাও এবং দ্রুত ফিরে যাও। যেভাবেই হোক, তাড়াতাড়ি যাওয়া আবশ্যক নতুবা মানুষের মাঝে এই ধারণার সৃষ্টি হবে যে, কাদিয়ান যেন খালি হয়ে গেলো, কেননা মসীহ্ মওউদ (আ:)–এর খান্দান যদি এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন না করে আর ত্যাগ স্বীকার না করে, তাহলে মানুষ কী করে কোরবানী করবে! ২০০৫ সনে আমি যখন কাদিয়ান গিয়েছিলাম তখন প্রায় এ ধরণের বাক্যেই সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব আমাকে সেই পুরো ঘটনাটি শুনিয়েছিলেন।

সেই একুশ বছরের যুবককে মসীহ্ (আ.) এর আবাসস্থলের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছিল, জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে যদি দেখা হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর কল্যাণে, উত্তরাধিকারসূত্রে তিনিই ছিলেন কাদিয়ানের সমস্ত সম্পত্তির মালিক। যার পিতা যুগ খলীফা ছিলেন আর যিনি তাঁর ছেলেকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, তোমার কাদিয়ানে অবস্থানই কাদিয়ানের দরবেশদের সাহস যোগানোর কারণ হবে এবং তোমার সেখানে থাকা আবশ্যক। এতসব বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মিয়া সাহেবের হৃদয়ে আমীরের আনুগত্য থেকে বিরত থাকার ধারণা স্থান করে নিতে পারেনি। বরং এই

চেতনা আরও গভীরভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, আমীরের আনুগত্যের উন্নত মানও আমাকে প্রদর্শন করতে হবে, যাতে দরবেশদের প্রত্যেকে আমাকে দেখে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি আমীরের আনুগত্যের দৃষ্টান্ত দেখায়। নিশ্চয় সেই মহান পিতার হিতোপদেশের প্রভাবই ছিল সেটা, যা তিনি তাঁর সন্তানদের দিয়েছিলেন এবং খোদার নিদর্শনাবলী (শায়ায়েরুল্লাহ) সংরক্ষণার্থে নিয়োজিত এই দরবেশ সন্তানকে বিশেষভাবে নির্দেশ করেছিলেন। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নসীহত ছিল, তুমি কখনও মনে এই ধারনাকে স্থান দেবেনা যে, তুমি নাযের। যুবা বয়সেই তিনি নাযের হয়েছিলেন। বরং সর্বদা তোমার হৃদয়ে যেন এই ধারণা থাকে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর পৌত্র তুমি এবং সে মোতাবেক স্বীয় জীবন তোমাকে গড়তে হবে এবং একেই নিজের প্রকৃত মর্যাদা মনে করতে হবে আর নিজেকে এই হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর পৌত্র হবার কারণে মনোভাবের প্রকাশটা ঘটবে কি রূপে ? নিশ্চয় তা এই যে, *'তোমার বিনয়াবনত পন্থা তাঁর পছন্দ হয়েছে।'* এবং নিশ্চয় যে উদ্দেশ্য সহকারে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-কে আবির্ভূত করেছিলেন তা পুর্ণ করতে হবে। ছোট-খাটো বিষয়ে নিজের সময় নষ্ট করবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) এবং জামাতের সম্মান অটুট ও অক্ষুন্ন রাখতে হবে। সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব এসব কথা নিজের হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছেন এবং আমল করেছেন আর দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন এবং খুবই ভালোভাবে সম্পাদন করেছেন এবং কাদিয়ান বাসী ও ভারতের জামা'ত সমূহে তা প্রচলন করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং **প্রত্যেক নিষ্ঠাবান আহমদীর উচিৎ, তা তিনি কাদিয়ানেই বাস করুন বা ভারতের অন্য কোন জামাতে বা যেখানেই থাকুন না কেন, প্রত্যেক কর্মকর্তা ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর খান্দানের প্রতিটি সদস্যের এরূপ আদর্শই স্থাপন করা উচিত।**

তাঁর জন্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি, তিনি জেদ্দা নিবাসী হযরত শেঠ আবু বকর ইউসুফ সাহেবের কন্যা হযরত আযিযাহ্ বেগম সাহেবার গর্ভে ১লা আগষ্ট, ১৯২৭ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে এটিও উল্লেখ করছি যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:) এর এখানে বিবাহ্ করার ইচ্ছা প্রথম দিকে ছিল না বরং অন্য কোথাও কথা হচ্ছিল। কিন্তু হযরত আযিযাহ্ বেগম সাহেবার বিবাহ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:)-এর সাথে হোক এটিই আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা ছিল আর সেই সম্পর্কে হযরত উম্মুল মু'মেনীন (রা:), হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) এবং অন্যান্যরাও এমনই কতক স্বপ্ন দেখেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে বারংবার তেমনটি প্রকাশিত হতে থাকে; যার ফলে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। হযরত মৌলভী সরওয়ার শাহ্ সাহেব যখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:)-এর নিকাহ্ পড়ান তখন তিনি একথা উল্লেখ করেন।

হযরত সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব এর জন্ম সম্পর্কে হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবার একটি রুইয়াও রয়েছে, আমি তা বলে দিচ্ছি। এটি আমাকে আমার খালা সাহেবজাদী আমাতুন নাসীর বেগম সাহেবা একটি পত্রে লিখেছেন। তিনি কোন পুরনো চিঠি খুঁজে বের করেন যা নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা তাঁর মাতাকে লিখেছিলেন অর্থাৎ, তাঁর মাতা সৈয়দা সারা বেগম সাহেবা যিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:)-এর পত্নী ছিলেন। সাহেবজাদী আমাতুন নাসীর বেগম সাহেবা লিখেন, আমার মনে হয় মিয়া ওয়াসীম আহমদের ক্ষেত্রে এই রুইয়া পূর্ণ হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর বড় মেয়ে নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা:) তার ভাবী সৈয়দা সারা বেগম সাহেবাকে এই চিঠি লিখেছিলেন। লিখেন–অবাক করা ব্যাপার! এদিকে আপনার পত্র থেকে বধুর সন্তান সম্ভবা হবার সংবাদ পাই অপর দিকে আমি সে রাতেই স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি ভাই সাহেবকে অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:)–কে স্বপ্নে এই স্বপ্ন বর্ণনা করছি যে, (স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন বলছি) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) আমার হাত ধরে এই শুভসংবাদ দিচ্ছেন– সম্ভবতঃ হাফিজ এবং তোমার ভাই এর ঘরে আযিযার ঔরশে ছেলে সন্তান হবে এবং এই সংবাদ শুনে ভাই সাহেব খুবই আনন্দিত হন। স্বপ্নেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী একান্ত আনন্দিত হন আর বলেন আমিও চেয়েছিলাম যেন আযিযার গর্ভেই হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) এক সময় তার সম্পর্কে বলেন যে, আমি আমার এক ছেলেকে একটি বিরান উপত্যকায় ছেড়ে দিয়েছি, আল্লাহ্ তাআলা তাকে কাজ করার তৌফিক দিন। দৃশ্যত কাদিয়ানতো জনবসতিপূর্ণ এবং শস্য-শ্যামল ছিল কিন্তু কাদিয়ানের দরবেশদের জীবন-যাত্রা শুরুতে খুবই অসচ্ছল ও বিপদসঙ্কুল ছিল। যদিও মু'মেন বিপদে ভীত হয় না কিন্তু চারপাশের অমুসলমানরা যে অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। যারা সেখানে ছিল তারাও চিন্তিত ছিল, যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে এখানে রাখা হয়েছে তা পালন করতে পারবো কি না আর বিশ্ব জামাত এবং যুগ খলীফাও একই বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন। এ জন্য তিনি দোয়া করছেন যে কোন ভয় যেন তাদেরকে সেই অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত করতে না পারে যারা দৃঢ় সংকল্পের সাথে সেখানে অবস্থান নিয়েছেন আর

যাদেরকে মসীহর আবাস স্থলের ঐশী নিদর্শনাবলী সংরক্ষণ করতে প্রেরণ করা হয়েছে, তারা যেন সে দায়িত্ব পালন করতে পারে। সে সময় অবস্থা এতটাই বিপদসঙ্কুল ছিল যে, কাদিয়ানে অবস্থানকারীদেরকে প্রশাসনও সর্বদা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো আবার পাকিস্তান থেকে যে সব হিন্দু বা শিখ ভারতে এসেছিল তারাও পাকিস্তানে অত্যাচারিত হবার কারণে বা যে কারণেই হোক না কেন এদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো । এর ফলে চরম বিরোধী দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখা হতো আর সুযোগ পেলেই তাদের শেষ করে দেয়ার হীন চেষ্টা হতো। এহেন পরিস্থিতিতে, বাহির থেকে খাদ্য সামগ্রির সরবরাহও যখন বন্ধ আর খাবারের যৎসামান্য যে মজুদ ছিল, কেবল তারই উপর নির্ভর করতে হতো অন্য কোন আয়ও ছিল না আর পরিস্থিতিও ছিল অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। কাদিয়ানের সে সকল দরবেশ যাদের সংখ্যা হবে কয়েক শত তাদের জন্য তখন বাস্তবেই এটি তৃণলতাহীন বিরাণ উপত্যকার দৃশ্যই উপস্থাপন করছিল।

তারপর ধীরে ধীরে মরহুম মোকাররম সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব এবং অন্যান্য দরবেশদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও দোয়া আর যুগ খলীফার দোয়া এবং জামাতের দোয়ার প্রভাব পড়তে থাকে, পাশাপাশি সহ অবস্থানকারী সমাজের সাথে সম্পর্কও গড়ে উঠতে থাকে, তাদের হৃদয়ও নরম হতে থাকে। এই দরবেশরা ধীরে ধীরে স্বস্তির শ্বাস নিতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে চলা দারিদ্র এবং আর্থিক অসচ্ছলতা বিরাজ করতেই থাকে। সে সময় জামাতের তহবিল থেকে দরবেশদের জন্য খুবই সামান্য ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এদ্দারা বড় কষ্টে পানাহার চলতো আর সে সময়ে হযরত মিয়া সাহেবের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:)-এর নির্দেশ ছিল, ভাতা সম পরিমানই পাবে। তাও আবার জামা'তের ফান্ড থেকে নয় বরং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) তাকে নিজের ব্যক্তিগত ফান্ড থেকে এটি দিতেন।

তারপর সময়ের প্রবাহে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে তাদের আয়-রোজগারও আরম্ভ হয়। কৃষি জমি থেকে মিয়া সাহেবেরও আয় আসতে থাকে। মোটকথা, চরম কষ্ট এবং প্রতিটি মূহুর্ত ভয় ও শঙ্কাপূর্ণ ছিল যা সেই সময়ে দরবেশরা কাটিয়েছেন আর এটি তাদের অসাধারণ ত্যাগ ছিল।

আমি মনে করি, এতেও খোদাতা'লার গভীর প্রজ্ঞা নিহিত ছিল । হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌তা'লা এই ব্যক্তিকে দরবেশি জীবন যাপন আর মহান ত্যাগের সুযোগ দিয়েছেন যার মাতামহের বংশ আরবদের অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং সেই অঞ্চলের কাছাকাছি বাস করতেন তারা যেখানে ইসমাঈলী কুরবাণীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছিল। হযরত নবাব মোবারাকা বেগম সাহেবা (রা:)-এর যে স্বপ্ন আমি এখন বর্ণনা করেছি তা থেকেও এটিই জানা যায় যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:) এর বাক্য যে, আমি এটিই চেয়েছিলাম যেন আযিযার গর্ভে হয়। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর স্বয়ং আগমন এবং শুভসংবাদ দেয়া, এসব কিছু বলছে যে, এই ছেলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা কোন অসাধারণ কাজ করাবেন আর তা ছিল এই 'মহান আত্মত্যাগ'। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর কুরবানী কবুল করুন।

হযরত মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের মধ্যে কুরবানীর এই স্পৃহা কত প্রবল ছিল, তা তাঁর এই কথা থেকে অনুমেয়– 'আমি দোয়া করেছি হে আল্লাহ্! আমাকে এখানেই থাকতে দাও'। কেননা প্রথমে নিয়ম ছিল, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:)-এর সন্তান এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর খান্দানের সদস্যরা একের পর এক পালা করে কাদিয়ান এসে কয়েক মাস অবস্থান করবেন। পরবর্তীতে অবস্থা এমন হয়েছে যে আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে পাকিস্তানে যারা আছে তারা পাকিস্তানেই থাকবে, যারা কাদিয়ানে আছে তারা কাদিয়ানেই থাকবে আর কেউই যাবে-আসবে না।

নিজের আকাঙ্খার উল্লেখ করতে গিয়ে মিয়া ওয়াসীম আহমদ সাহেব একবার বলেছেন– আমার হৃদয়ের একান্ত ইচ্ছা ও দোয়া ছিল আমি কাদিয়ানে থেকেই যেন খিদমত করতে পারি। তাই এজন্য একবার আমি আমার জায়নামায নিই এবং কাদিয়ানের কস্‌রে খিলাফত এর বড় কক্ষে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে নফল আদায় করা আরম্ভ করি এবং বলা হয় যে, যদি দোয়া কবুল হওয়ার থাকে তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা তার জন্য উপকরণ সৃষ্টি করেন। এত অনুনয়-বিনয় ও কাতরতার সাথে আমি দোয়া করার সুযোগ পাই যাতে মনে হচ্ছিল যে, খোদা তা কবুল করবেন।

আমি দোয়া করি আর খোদাতা'লার সমীপে নিবেদন করি, আমি কাদিয়ান থেকে যাবো না তুমি কোন ব্যবস্থা কর। তারপরে বলেন, কাদিয়ানের অমুসলমানরা সরকারের কাছে অভিযোগ করেছে যে, এই দল এখানে যাওয়া আসা করেই যাচ্ছে। এখানে এলে এখানকার হয়ে যায় আর পাকিস্তানে গেলে এরা পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শণ করে, এরা একাজই করে। তাই, এই রীতি বন্ধ করে দেয়া উচিৎ। সুতরাং তাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করে যে, কেউ যাওয়া-আসা করতে পারবে না আর এভাবেই মিয়া সাহেব স্থায়ীভাবে কাদিয়ানের বাসিন্দা হয়ে যান আর আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে সেখানে বসবাসের সুযোগ করে দেন।

সেখানকার বিরাজমান পরিস্থিতিতে কিভাবে ছিলেন আর প্রয়োজনে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে কিভাবে ধৈর্য্য এবং

সাহসের সাথে কষ্ট সইবার সামর্থ দিয়েছেন, ত্যাগের সেসকল কথার কিছুটা তুলে ধরছি। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৫২ সনে হযরত উম্মুল মু'মেনীন নুসরত জাঁহান বেগম সাহেবা (রা:) যখন পরলোক গমণ করেন, পরিস্থিতি অনুকূল না হবার কারণে তিনি পাকিস্তান যেতে পারেন নি আর ভারতে বসে তিনি একাই সেই বিয়োগ ব্যাথা সয়েছেন। আমার জানা মতে, সে সময় তিনি পড়াশোনার কারণে লক্ষ্ণৌ অবস্থান করছিলেন। কিছু সময়ের জন্য তফসীরের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁকে লক্ষ্ণৌ পাঠিয়েছিলেন আর সেখানে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রও অধ্যয়ন করছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা:) এরও, নিজের সংগ্রামী এই দরবেশ ছেলের আত্মত্যাগের কারণে তাঁর প্রতি গভীর মমতাপূর্ণ টান ছিল আর এই যে ঘটনা আমি বর্ণনা করলাম, যখন তিনি (রা.) বিবাহের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান এসেছিলেন কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে বলেছিলেন, এখনই ফিরে যাও। তিনি (রা.) যখন প্লেনের টিকিট পেয়ে গেলেন আর প্লেনে যাত্রার দু'দিন মাত্র বাকি ছিল, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:) তা জানতে পেরে নিজেই লাহোর চলে আসলেন। এটি বলেন নি যে, দু'দিন বাকি আছে রাবোয়ায় এসে তারপর যাও বরং মিয়া সাহেবকে বলেছিলেন, ওখানেই থাকো আমি আসছি। তিনি স্বয়ং লাহোর আসেন বিভিন্ন দিকনির্দেশনা এবং নসীহত প্রদান করেন এবং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে বিদায় জানান এবং দোয়া দেন আল্লাহ্তা'লা তাঁকে ভালোভাবে কাদিয়ান পৌঁছান আর তাঁকে মসীহ্র আবাস স্থলের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন।

হযরত ডাক্তার হাশমত উল্লাহ্ সাহেব পরবর্তিতে মিয়া সাহেবকে বলেছিলেন, মিয়া সাহেব নিজেই বলেছেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:) ওয়ালটন এয়ারপোর্টে (সেসময় লাহোর এয়ার পোর্টের নাম ছিল ওয়ালটন) আমাকে প্লেনে উঠিয়ে দেয়ার সময় যতক্ষন পর্যন্ত প্লেন দৃষ্টির আড়ালে না গিয়েছে ততক্ষন প্লেনের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে দোয়ায় রত থেকেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:)-এর এই সম্পর্কের ব্যাপারে হযরত সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের বেগম সাহেবা বলেন, কাগজ-পত্র যখন তৈরী হয়ে গেল এবং বিবাহের এক বছর পর আমি কাদিয়ান যাচ্ছিলাম তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:) বিশেষভাবে আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'উম্মে নাসের' এর ঘরে থাকবে যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)–এর ব্যাপক যাতায়াত ছিল আর এর আঙ্গিনাতে হুযূর দরসও দিয়েছিলেন (সম্ভবত: হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:)-ই দরস দিয়েছিলেন,স্পষ্ট নয়)।

সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সম্পত্তি উদ্ধারের ক্ষেত্রেও হযরত মিয়া ওয়াসীম আহমদ সাহেবের খিদমত উল্লেখযোগ্য। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর পরিবারের সদস্য এবং তাঁর পৌত্র হবার সুবাদে সরকার এটি বিবেচনা করেছে এবং সদর আঞ্জুমানের সম্পত্তি তিনি ফিরে পেয়েছেন নতুবা অনেক অজুহাত দেখাতে পারতো তারা। এর জন্য তিনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং সে সময় ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহর লাল নেহেরুর সাথেও যোগাযোগ করেন এবং আল্লাহ্তা'লা করুণা করেছেন, এর ইতিবাচক ফল প্রকাশ পেয়েছে।

১৯৬৩ সনে তাঁর মাতা মোহতারমা সৈয়দা আযিযাহ্ বেগম সাহেবা মৃত্যু বরণ করেন এবং অনেক কষ্টে তিনি পাকিস্তানে আসার অনুমতি পান আর দাফনের সময় পৌঁছতে সক্ষম হোন।

এরপর ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধ চলাকালে যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভারত এবং কাদিয়ানের সাথে চিঠি-পত্র এবং টেলিফোন ইত্যাদির যোগাযোগও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল। তিনি বলেন যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:)-এর অসুস্থতার সংবাদও আমরা পাকিস্তান রেডিওর সংবাদ থেকে জানতে পাই আর মৃত্যুর সংবাদও অবহিত হয়েছিলাম পাকিস্তান রেডিওর বদৌলতে। জামাতের সাথে যোগাযোগের পরে তারা শ্রীলংকা থেকে নিশ্চিত হয়েছিলেন। যাইহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:)-এর মৃত্যুর সময়ও তিনি কাদিয়ানেই ছিলেন।

এ সম্পর্কে কেউ লিখেছেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:)-এর ইন্তেকাল হলে তিনি (রা.) সকল দরবেশদের কাদিয়ানের মসজিদ মোবারকে সমবেত করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। পরম দুঃখের সেই মূহুর্তে কাদিয়ানের দরবেশদেরকে ধৈর্য্য এবং দোয়া করার উপদেশ দেন, এরপর তিনি বলেন, সর্বদা আমার এই দোয়া এবং আকাঙ্খা ছিল, হে খোদা! যখনই হযরত আব্বাজান অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা:)-এর শেষ মূহুর্ত আসবে তখন আমি যেন তাঁর পাশে উপস্থিত থাকতে পারি। কিন্তু এমন অবস্থায় হুযূরের মৃত্যু হয়েছে যে, আমার যাওয়া অসম্ভব। এর মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লা আমাকে একথা বুঝিয়েছেন যে, কাদিয়ান এবং ভারতের সকল আহমদী সদস্য হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:)-এর সন্তানের মতই, সবাই বিচ্ছিন্নতার শোকে মূহ্যমান তুমিও তাদের সাথে সেভাবেই বিচ্ছিন্নতার বেদনা সহ্য কর যেভাবে তারা করছে। আর তোমার কাদিয়ানে অবস্থান তাদের জন্য নিরাপত্তা ও সান্তনার কারণ হবে।

এরপর ১৯৭১ সনে দু'দেশের সম্পর্কের

অবনতি হয় এবং বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা কাদিয়ানের আহমদী অধিবাসীদের জোর করে কাদিয়ান থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করে আর নিম্নপদস্থ কমকর্তারা নির্দেশ জারি করে যে এরা বেরিয়ে যাক। কিন্তু এর জন্য অজুহাত যা দেখিয়েছিল তা হলো– আমরা আপনাদের নিরাপত্তা বিধান করতে চাই, কাদিয়ানে থাকলে নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব নয়। তাই আহমদী মহল্লা এবং দারুল মসীহ্'র সব কিছু খালি করে দিন যেন আমরা আপনাদেরকে একস্থানে একত্রিত করতে পারি এবং সেখানে আপনাদের নিরাপত্তা দিতে পারি। আসলে নিরাপত্তা দেয়া উদ্দেশ্য ছিল না। আমার মনে হয় সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছিল। ধারণা নয় বরং অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, তাদেরকে অর্থাৎ কাদিয়ানবাসীদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখা হত। সে সময়ও হযরত সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব কাদিয়ানের সকল আহমদী সদস্যকে মসজিদ মোবারকে সমবেত করেন এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, এটি আমাদের স্থায়ী কেন্দ্র আমরা কখনই এটা পরিত্যাগ করবো না। তাদের ধারণা ছিল; এভাবে আহমদীরা খালি করবে আর আমরা সে স্থান দখল করে নিব। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, এটি আমাদের স্থায়ী কেন্দ্র আমরা কোন ক্রমেই একে পরিত্যাগ করবো না, আজকের রাতটি কেবল আমাদের হাতে আছে। আপনাদের দোয়া দ্বারা খোদার আরশকে প্রকম্পিত করুন। যদি আমাদের সম্পর্কে সরকারের এটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে স্মরণ রেখো! একটি শিশুও স্বেচ্ছায় কাদিয়ানের বাইরে যাবে না। আমরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিবো কিন্তু পবিত্র স্থানগুলো ছেড়ে কাদিয়ানের বাইরে যাবো না। তিনি আরো বলেন যে, আপনারা স্মরণ রাখবেন আমি নিজেও এখান থেকে বাহিরে যাবোনা কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা যদি আমাকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায় তাহলে নিতে তো পারে, তবে আমি নিজ পায়ে হেঁটে যাবো না। আপনাদের মধ্যে প্রত্যেক দরবেশ এবং তাদের সন্তানদেরও অবস্থান এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হতে পারে যে, আমাকে নিয়ে যাবে আর বলবে যে, আমরা তোমাদের মিয়া সাহেবকে নিয়ে গেছি এজন্য তোমরাও চলো। তারা আমাকে নিয়ে গেলে নিয়ে যাক আপনারা যাবেন না এবং জামাতের প্রতিটি সদস্যের মুখ থেকে এই আওয়াজই বের হওয়া উচিৎ যে, আমরা কাদিয়ান ত্যাগ করবো না। লেখক বলেন, সেইরাতে কাদিয়ানের শিশুদের অবস্থাও এমন হয়েছিল যে, যেভাবে কেউ কারো সাথে চিমটে লেগে থাকে, সেভাবেই যেন খোদাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল তারা। মসজিদ মোবারকের প্রতিটি কোণা এবং মসজিদ আকসার প্রত্যেক প্রান্ত, বেহেশতি মকবেরার সর্বত্র দোয়া হচ্ছিল আর বলা হয়, প্রত্যেক গৃহের দেয়াল এর সাক্ষী যে, দরবেশদের হৃদয় থেকে নির্গত ওই আহাজারি ও ক্রন্দন খোদার দরবারে কড়াঘাত করছিল। তাদের সিজদার স্থান ভিজে গিয়েছিল, তাদের মাথা খোদার সমীপে সমর্পিত ছিল। শত শত হাত খোদার দরবারে পাতা ছিল আর এভাবেই তারা দিন-রাত অতিবাহিত করেছে, পরিশেষে আল্লাহ্‌তা'লা তাদের দোয়াসমূহকে গ্রহণীয়তার মর্যাদা প্রদান করেন, পরবর্তী দিন কিছু প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করতে আসেন, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা স্বয়ং কাদিয়ান আসেন এবং পবিত্র স্থান সমূহ্ পরিদর্শন করেন আর জেলা প্রশাসক ও অন্যান্যদের সুপারিশের ফলে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়।

তাঁর দোয়া সম্পর্কে সেখানে বসবাসরত আমাদের একজন মোবাল্লেগ আমাকে লিখেছেন, কিছু দিন আমি দারুল মসীহ্‌তে থাকার সৌভাগ্য লাভ করি, অধিকাংশ সময় আমি দেখেছি, মিয়া ওয়াসীম আহমদ সাহেব রাতে 'বাইতুদ দোয়া'তে বা অন্যান্য স্থান যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) দোয়া করতেন সেখানে দোয়াতে নিমগ্ন থাকতেন।

যেভাবে আমি বলেছি, ১৯৭৭ সনে হযরত মৌলভী আব্দুর রহমান জাট সাহেবের মৃত্যুর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে:) তাঁকে আমীর মোকামী এবং নায়ের আলা মনোনীত করেন। এভাবে তিনি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব লাভের মাধ্যমেও জামাতের খিদমত করেছেন।

১৯৮২ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে:) ওফাত লাভ করেন। সে সময়ও তিনি রাবওয়া আসতে পারেন নি, তাঁর বড় দু মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ছোট মেয়ে এবং ছেলে সম্ভবত: তাঁর সাথে ছিল। তাঁর মেয়ে আমাতুর রউফ এর বিবৃতি হচ্ছে, খিলাফতের প্রতি আব্বার একান্তই গভীর অনুরাগ ছিল এবং খলীফা হুযূরের মৃত্যুর একদিন পূর্বে একটি চিঠি নিয়ে তিনি আম্মা এবং আমার কাছে আসেন আর বলেন, এটি পাঠ করো এবং এতে স্বাক্ষর করে দাও। অর্থাৎ স্ত্রী এবং মেয়ের কাছে নিয়ে যান তাদের স্বাক্ষরের জন্য। এতে নাম বিহীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'র হাতে বয়আত গ্রহণ সম্পর্কে লেখা ছিল। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে লিখে বয়আত করেছিলেন যে, এটি আমি এখনই পাঠাচ্ছি। এই মেয়ে বলেন, আমি বললাম; আব্বা এখনও তো খলীফার নির্বাচন হয়নি, আমরা জানি না কে খলীফা হবেন? তিনি (রা.) বলেন, আমি খলীফার চেহারা দেখে বয়আত করবো না বরং আমিতো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর খলীফার বয়আত

করবো, আল্লাহ্‌তা'লা যাকেই খলীফা বানাবেন আমি তাঁর হাতেই বয়আত করবো। তাই আমি এই পত্র লিখেছি আর তা পাঠাচ্ছি যেন খেলাফতের নির্বাচন যখন হবে তখন আমার বয়আতের চিঠিও সেখানে পৌঁছে যায়। খিলাফতের প্রতি এই ছিল তাঁর ভালবাসা, প্রেম আর ব্যুৎপত্তি। আল্লাহ্‌ করুন সবাই যেন তা লাভ করতে পারে।

বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা মামলাও দায়ের করা হয়েছিল। অনেক আপনজনও তাঁকে বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল কিন্তু অত্যন্ত সাহস ও ধৈর্য্যের সাথে তিনি সব কিছু সহ্য করেছেন। বরং শুনেছি, সে সকল বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য থেকে অনেকে তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্যও এসেছিল।

জামাতের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সময় তিনি সমগ্র ভারত সফর করেন এবং জামাতসমূহকে সংগঠিত করে তাদেরকে যথাযথ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে (রাহে:)-এর কাদিয়ান সফরের প্রাক্কালে তিনি ব্যবস্থাপনার সমুদয় দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। এরপর ২০০5 সনে আমি যখন সফরে যাই তখন তাঁর শরীর খুবই খারাপ ছিল, দূর্বলতাও বোধ করতেন ভয়াবহ ইনফেকশান হয়ে গিয়েছিল অসুস্থ ছিলেন আর জ্বরও ছিল তা সত্ত্বেও যেহেতু আমার কাছ থেকে জলসার প্রথম অধিবেশনে তার সভাপতিত্ব করার মঞ্জুরী নেয়া হয়েছিল, তাই তিনিই তাতে সভাপতিত্ব করেন। ঘটনাক্রমে ঘরে এসে আমি যখন এমটিএ দেখলাম তখন সংবাদ পাঠালাম, আপনি অসুস্থ তাই দায়িত্ব অন্য কাউকে দিয়ে ফিরে আসুন। তিনি একথা বলেন নি, আমার জ্বর, আমি অসুস্থ বসতেও পারি না। প্রচন্ড দূর্বলতাও আছে, কিন্তু যুগ খলীফার পক্ষ থেকে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমার নাম যেহেতু মঞ্জুর হয়েছে তাই করতে হবে। যাই হোক, সংবাদ পাওয়ার পর তিনি চলে আসেন। বসার মত অবস্থাই ছিল না। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করতেন। আমাদের আবাসনের ব্যবস্থা যেখানে করা হয়েছিল সেখানে ছোট-খাটো কিছু কাজ করার প্রয়োজন রয়ে গিয়েছিল। আমি দেখেছি মিস্ত্রীদের নিয়ে এসে স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করিয়েছেন। যদিও শরীর তখনও যথেষ্ট দূর্বলই ছিল। খিলাফতের সাথে গভীর অনুরাগের কিছু কথা আমি এখন বললাম পরে আরো কিছু বলবো।

তিনি গভীর ভাবে খোদা নির্ভর ছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লার সাথে একান্ত ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তাঁর। মহানবী (সা:) এবং হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ:)-এর সাথে প্রগাঢ় ভালবাসা রাখতেন তিনি। পরবর্তীতে খিলাফতের সাথেও সেই ভালবাসাই ছিল এবং খিলাফতের প্রতি একান্ত আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা পোষণ করতেন। খিদমতের প্রেরণা ছিল। মসীহ্‌ মওউদ (আ:)-এর সাহাবীদেরকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। দরবেশদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল বরং একবার কেউ দরবেশদের সম্পর্কে এমন কোন উক্তি করে বসে যা তিনি অপছন্দ করেন এবং এতে অসন্তোষ ব্যক্ত করেন যদিও তাঁর স্বভাব এমন ছিল না যে যাতে মনে হয়, তিনি কখনও অসন্তুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু দরবেশদের জন্য তাঁর আত্মাভিমান এরূপই ছিল যে, তিনি তা সহ্য করতে পারেন নি।

অতিথিসেবা তাঁর অনেক বড় এক বিশেষত্ব ছিল। রাতের বেলা যদি কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসতো তাহলে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের সাথে সাক্ষাত করতেন। তাঁর বেগম সাহেবা বর্ণনা করেন যে, দু'ঈদের সময় বিধবাদের সাথে স্বাক্ষাত করতে এবং তাদেরকে উপহার দিতে তিনি আমাকে বিশেষভাবে পাঠিয়ে দিতেন। পুরুষ বা মহিলা যে কেউ অসুস্থ হলে তাদের খোঁজ-খবর নিতেন আর কেউ বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে অমৃতসর হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন। দরবেশদেরকে তিনি একেবারেই নিজ সন্তানদের ন্যায় প্রতিপালন করেছেন। অতিথি সেবার ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর সহধর্মিনী বলেন, আমরা হয়তো অন্যত্র তিন মাস কাটিয়ে ঘরে ফিরেছি মাত্র, তখনও কোন অতিথি এসে গেলে তিনি বলেন, অতিথি এসেছে নাস্তা-পানি পাঠাও। আমি বললাম, সবে মাত্র আমরা এসেছি, জানি না ঘরে কিছু আছে কি নাই, কি পাঠাবো? উত্তরে মিয়া সাহেব বলেন, এধরনের উত্তর দেয়া উচিৎ নয়। খুঁজে দেখ। কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই, যাই হোক বিস্কুটের একটি প্যাকেট পাওয়া গেলে তাই পাঠানো হয়। এমনি খুঁটি-নাটি বিষয়ের প্রতিও প্রখর দৃষ্টি রাখতেন তিনি।

প্রথমে গয়ের আহমদীদের সাথে সম্পর্কের অবস্থা তেমনই ছিল, যা উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর এ সম্পর্কও এত মধুর হয়ে ওঠে যে, সবাই তাঁকে ভালোবাসতো। ২০০5 সনে আমি যখন সফরে যাই তখন আমরা হুশিয়ারপুরও গিয়েছিলাম। সেখানে বসবাসকারী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁর কারণে আমাকেও তাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং একান্ত ভালবাসা প্রকাশ করেন। শিখ ও হিন্দুদের মধ্য থেকে যাদের সাথেই সাক্ষাত হতো সবাই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতো এবং তাঁর গুণের উল্লেখ করতো। এখন তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অনেক শিক্ষিত শিখ, হিন্দু, সংসদ

সদস্য, ব্যবসায়ী, উকিল, দরিদ্র মানুষজন এমনকি সংসদের একজন সাবেক স্পীকারও এসেছেন। সবার কথা-বার্তা আমি ভিডিও ক্যাসেটে শুনছিলাম। ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন এবং বলছিলেন যে, এমন এক মানুষ ছিলেন তিনি, যিনি ধর্মের উর্ধ্বে থেকে আমাদের সাথে সম্পর্ক রেখেছেন আর আমাদেরকেও এটিই শিখিয়েছেন যে, মানবতার বন্ধনকে দৃঢ় করা প্রয়োজন, মানবিক সম্পর্ককে মজবুত করা উচিৎ। সবাই প্রশংসা করছিলেন। অগণিত ছোট-ছোট ঘটনা আছে যা মানুষ আমাকে শোকবার্তায় লিখেছেন আমি যদি তা উল্লেখ করতে থাকি তবে বিবরণ অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

হযরত মিয়া সাহেবের আরেক বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি খুবই মাপজোখ ও চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলতেন। কোথায়ও মুখ ফস্কে এমন কোন কথা যেন বেরিয়ে না যায়, যা জামাতের রীতি বহির্ভূত হতে পারে। কোথাও এমন কোন কথা না হয় যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) এবং মহানবী (সা:)-এর মর্যাদার পরিপন্থি হতে পারে। কোথাও এমন কোন কথা যেন না হয় যাথেকে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পায় বা যা দরবেশসুলভ বিনয়ের পরিপন্থি যা আমাকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

একবার কানাডাতে কেউ তাঁর কাছে দরবেশদের কুরবাণী এবং কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁর অনেক প্রশংসা করে। তিনি (রা.) বলেন, দেখ! বাস্তব ঘটনা হলো, আমরা দরবেশরা কাদিয়ানের নিরাপত্তা বিধান করিনি বরং কাদিয়ানের পবিত্র স্থানসমূহ এবং সেখানে কৃত দোয়াসমূহই কেবলমাত্র কাদিয়ানেরই নয় বরং সেখানে বসবাসকারীদেরও হেফাযত করেছে।

এ-ই হচ্ছে, একজন মুমেনের চিন্তা ও ভাবনা, যা কিছুই হয় আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে হয় তাই আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে দোয়া করার সুযোগ প্রদান করেছেন এবং তাঁর প্রিয় মসীহ্‌র প্রিয় জনপদকে সকল অনিষ্ট থেকে কেবল তাঁর কৃপায় রক্ষা করেছেন। আমাদের দোয়াসমূহকে কবুল করতঃ পবিত্র স্থান সমূহের পাশাপাশি আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। একজন শোকবার্তা লিখেছেন, তাতে এ বাক্যটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন যে, ***তিনি সংগ্রামী মহিমায় দরবেশসুলভ জীবন অতিবাহিত করেছেন***, বাস্তবও এরূপই ছিল।

আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও সাধ্যমত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ করতেন। যুগ খলীফার পক্ষ থেকে যে কোন তাহরীকই করা হতো, প্রথমে নিজে অংশ নিতেন তারপর জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে আমাকে লিখেছেন, আমি খিলাফত জুবিলীর জন্য এক লক্ষ রুপী প্রদানের ওয়াদা করেছিলাম কিন্তু আদায় করতে ভুলে গিয়েছিলাম। অত্যন্ত কৈফিয়তমূলক পত্র লিখেছিলেন এবং লিখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্ যে, যথা সময়ে আমার মনে পড়েছে আর আজ আমি তা আদায় করে দিয়েছি এবং মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই এই হিসাবও পরিশোধ করে গেছেন। ওসীয়্যতের আদায় যথারীতি করতেন। হিস্যায়ে জায়েদাদের ১/৯ ভাগও নিজ জীবদ্দশায়ই পরিশোধ করে গেছেন। দরবেশদের দেখাশোনার কথাতো আমি পূর্বেই বলেছি।

খিলাফতের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে আমি পূণরায় বলছি। যদি কোন নির্দেশ বা দিক নির্দেশনা যেতো তাহলে হুবহু যেভাবে বলা হতো সেভাবে দ্রুত তা পালন করতেন। অনেকের অভ্যাস থাকে যে, কোন বাক্য যদি সুস্পষ্ট না হয় তাহলে ব্যাখ্যা করা আরম্ভ করে। যে কথার দু'টি অর্থ হতে পারে তার মধ্য থেকে যে অর্থ নিজ ইচ্ছা মত হয় তা গ্রহন করে। তিনি দ্রুত বুঝতে পারতেন যে, যুগ খলীফার উদ্দেশ্য কি?

আমি পূর্বেও বলেছি, যুগ খলীফার কোন নির্দেশ এলে অসুস্থ থাকা সত্বেও প্রয়োজনে স্বয়ং উপস্থিত থেকে পালন করাতেন। সম্প্রতি দেড় বছর পূর্বে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, এর ফলে মসজিদে আকসারও খানিকটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মসজিদ মেরামতের কাজ চলছিল। এখান থেকে প্রকৌশলীরাও গিয়েছেন। সেখানকার মাটি সম্পর্কে আরো কি জরিপ চালানো যায় তা মাটি খনন করে দেখা দরকার ছিল। এই কাজ মিয়া সাহেব ছাড়াও হতে পারতো কিন্তু তিনি সে সময়ে ঘটনাস্থলে যান, নিজ দায়িত্বে এই কাজ সম্পন্ন করান। যে প্রকৌশলী এখান থেকে গিয়েছিলেন হেসে তাঁকে বলেন, হযরত সাহেবকে আমার সম্পর্কে বলবেন যে আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম। একথা বলবেন যে, আমি হাঁটতে পারছিলাম না কিন্তু তা সত্বেও আমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কোন লৌকিকতা ছিল না যে, আমি অসুস্থ হওয়া সত্বেও এখানে এসেছি অনুগ্রহ স্বরূপ নয় বরং যুগ খলীফার দোয়া পাবেন এজন্য এসেছিলেন। খিলাফতের সাথে এরূপ প্রগাঢ় ছিল তাঁর সম্পর্ক ।

সম্প্রতি কয়েক মাস পূর্বে অসুস্থতা সত্বেও কাশ্মীরে তিনি (রা.) ব্যাপক সফর করেন এবং সর্বত্র খিলাফতের সাথে নিবিড় সম্পর্কের ব্যাপারে মানুষকে উপদেশ প্রদান করেন।

এ ছাড়া দোয়ার জন্য মানুষ তাঁকে যে চিঠি-পত্র লিখতো, তাঁকেই সম্বোধণ করে চিঠি লিখতো, কিন্তু তিনি যদি মনে করতেন যে, এই চিঠি খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে যাওয়া উচিৎ তাহলে এখানে পাঠিয়ে দিতেন যেন তাদের জন্য দোয়া হয় আর এখান থেকেও উত্তর যায়। তিনি আমাকে লিখেছেন, কিছুদিন আগে রোগ অনেক বেড়ে

যাওয়ায় তিনি ভালোভাবে কাজ করতে পারছিলেন না। তাই তিনি লিখেন, কিছু দিনের জন্য অন্য কাউকে নিযুক্ত করুন এবং তার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করুন। প্রত্যুত্তরে আমি তাঁকে লিখেছিলাম কাউকে দায়িত্ব দেয়ার প্রয়োজন নেই। যার কাছ থেকে ইচ্ছে কাজ নিন, নায়ের আলা আপনিই থাকবেন। এখন আমার মনে হয় যে তিনি নিজেকে কষ্টে নিপতিত করেও এই কাজ করতে থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর সম্প্রতি একটি বিষয়ের রিপোর্ট আমি পেয়েছি। এতে ২৫শে এপ্রিল তারিখে তিনি স্বাক্ষর করেছেন। অর্থাৎ সেসময়ও যেদিন তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আর ভয়াবহ Infection ছিল। জ্বরের তাপমাত্রা ছিল ১০৪-১০৫ ডিগ্রী। কিন্তু পুরো রিপোর্ট দেখে তারপর স্বাক্ষর করেছেন।

আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:)-এর এই সন্তান এবং তাঁর (রা:)- নিজের এ নিদর্শনের পদমর্যাদা উন্নত করুন যিনি তাঁর দরবেশ হিসেবে নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, খুব ভালোভাবে পুরো করেছেন। স্বভাবতই তাঁর মৃত্যুর পরে আমার চিন্তা হলো যে, একজন প্রবীণ কর্মী আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন। তিনি কেবল আমার মামাই ছিলেন না বরং আমার একটি শক্তিশালী হাতও ছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে আমার জন্য পরম সাহায্যকারী বানিয়েছিলেন। যাই হোক চিন্তিত ছিলাম তারপর আল্লাহ্‌তা'লার ব্যবহার এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর সাথে কৃত খোদাতা'লার প্রতিশ্রুতি দেখে আশ্বস্ত হয়েছি। আল্লাহতালা ইনশাআল্লাহ্ চিরায়ত রীতি অনুসারে নিজ কৃপায় এই শূণ্যতা পূর্ণ করবেন এবং পূর্বের তুলনায় আরো বড় ত্যাগী সাহায্যকারী দান করবেন আর তিনি তা করেনও ।

আল্লাহ্‌তা'লা দরবেশদের সন্তানদের এবং কাদিয়ানে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এরূপ ত্যাগী দরবেশদের নেক কর্মসমূহকে জীবন্ত রাখার তৌফিক দিন আর বর্তমানে তাদের মাঝে যে ক'জন দরবেশ আছেন তাদের সেবা করার তৌফিক দিন। কাদিয়ানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী সেই মর্যাদাকে অনুধাবন করুন যা 'দিয়ারে মসীহ্'তে বসবাসকারীদের হওয়া উচিৎ। প্রবীণরা চলে গেলে পর নব প্রজন্মের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায় আর জীবন্ত জাতির নবীনেরা সেই দায়িত্বাবলী সুচারুভাবে সম্পাদনের চেষ্টা করে।

আমি আশা করি, কাদিয়ানে বসবাসকারী সকল ওয়াকফে যিন্দেগী এবং কর্মকর্তারা পূর্বের চেয়ে পরস্পরের প্রতি আরো বেশি প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করবেন আর এভাবে তারা ত্বাকওয়া ও পুণ্যে উন্নতি করবেন। কাদিয়ানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর আধ্যাত্মিক সন্তান হবার সুবাদে সেই দায়িত্ব পালন করবেন আর যেভাবে আমাদের এই বুযূর্গ সে সকল স্থানে সেজদাবনত হয়েছেন যেখানে যুগ মসীহ্ সেজদা করেছেন আর সেই স্থানকে নিজ দোয়ায় ভরে দিয়েছেন, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর সাথে সে সকল স্থানের উন্নতির প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন তাই এরা (নব প্রজন্ম) যারা সেখানে বসবাস করছে সে সকল স্থানে যাবে আর পূর্বের তুলনায় আরো বেশি আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে সেজদাবনত হবে, দোয়া করবে, তাঁর কৃপা লাভের চেষ্টা করবে আর আমার এ দুশ্চিন্তা দূর করবে যে, কাদিয়ানে নেকী আর ত্বাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনকারী লোকদের সংখ্যা কমছে-নয়, বরং এই আনন্দের সংবাদ পাবো যে, তাক্বওয়ায় অগ্রগামী মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলছে। আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে এর তৌফিক দিন।

বিশ্বের জামাতগুলোর কাছেও কাদিয়ানের প্রাপ্য আছে, এ জনপদে বসবাসকারীদের জন্য প্রত্যেক আহমদী দোয়া করুন আল্লাহ্‌তা'লা যেন সর্বদা 'মসীহ্র জন্মস্থান'-এর অধিকার প্রদানকারী প্রজন্ম সৃষ্টি করতে থাকেন। হযরত মিয়া সাহেবের সহধর্মীনির জন্য দোয়া করুন। তিনিও অসুস্থ থাকেন, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকেও সাহস ও মনোবল দিন এবং এই শোক সইবার তৌফিক দিন। তিনিও অত্যন্ত কল্যাণময় সত্তা। তিনি জামাতের মহিলাদেরকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে, তাদের প্রতি সহানূভুতি প্রকাশের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছেন এবং রাখছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে সুস্বাস্থ্যময় ও শান্তিপূর্ণ জীবন দান করুন। তাঁর সন্তানদেরকেও শ্রদ্ধেয় বুযূর্গ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন, যদিও তাদের কেউই কাদিয়ানে নেই। মেয়েরা বিয়ের পর পাকিস্তান চলে গেছে এবং এখন তারা পাকিস্তানের নাগরিক। তাঁর ছেলে আমেরিকাতে থাকে কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণকারী যেন হয় আর সে সকল গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা করে যা তাদের পিতার মাঝে ছিল।

হুযূর আনোয়ার (আই:) সানী খুতবার সময় বলেন, আমি যেভাবে বলেছিলাম যে, অনেক অ-আহমদী বরং ব্যাপক সংখ্যক অ-আহমদী এসেছেন এবং মিয়া সাহেবের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। কাদিয়ানের ব্যবস্থাপকগণ আমার এই খুতবা শুনছেন, আমার পক্ষ থেকে তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

[জুমুআ নামাযের পর হুযূর আনোয়ার (আই:) হযরত সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের গায়েবী জানাযার নামায পড়ান]

(হুযূর আনোয়ার (আই:)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনূদিত)

সালামের গুরুত্ব ও কল্যাণ

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সালামের আদান প্রদান হয়ে আসছে। কিন্তু তাদের সালাম আদান প্রদানের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নেই বা ছিল না। যেমন, হিন্দু সম্প্রদায় দেখা সাক্ষাত হলে বয়োজেষ্ঠ গুরুজনকে আদাব বা নমস্কার ইত্যাদি বলে থাকে। কিন্তু এর মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে কোন তাৎপর্য নেই। আর, বড়োরা ছোটদেরকে আদব বা নমস্কার করে না। ইউরোপ, আমেরিকার খৃষ্টান সম্প্রদায় গুডমর্নিং, গুড আফটারনুন, গুড ইভিনিং, গুড নাইট ইত্যাদি বলে সাদর সম্ভাষণ জানায়। তাদের এইরূপ সাদর সম্ভাষণ জানাতে হলে বিশেষ করে আদৌ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে যে, সূর্য কোন স্থানে অবস্থান করছে। এর মধ্যে একদিকে যেমন অনাগত কোন মর্যাদা নেই তেমনি অপরদিক দিয়ে এর কোন পার্থিব কামনা-বাসনা ব্যতিত পারলৌকিক কল্যাণ ও শান্তি কামনার শুভ ইচ্ছা মোটেও নেই। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব সামাজিক ভাবে প্রীতি প্রেম ও পরস্পর মহব্বতের বন্ধন ব্যতিত চলতে পারে না। সৃষ্টির সেরা এই মানুষ পৃথিবীতে চলার পথে কিরূপে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় সাদর সম্ভাষণ ও অভিবাদন করে চলবে ইসলাম প্রবর্তক হযরত রসূল করীম (সা.) সর্দপূর্ণভাবে এই শিক্ষা প্রদান করেছেন। ইসলামে সালাম সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয় না। এটা একটি দোয়া বিশেষ। দেখা সাক্ষাতে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে দোয়া করেন শান্তি ও কল্যাণ কামনা করেন। সালাম শব্দের শাব্দিক অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা। “আস্সালামু আলাইকুম” বা তোমাদের ওপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক। উত্তরে ওয়া আলাইকুম ওয়া স্সালাম বলে পরস্পর শান্তি নিরাপত্তা ও কল্যাণ কামনা করে। ইসলামের বিধানানুসারে দেখা সাক্ষাতে পরস্পর পরস্পরের জন্য শান্তি নিরাপত্তা কামনা করে যে দোয়া করা হয় তার নামই সালাম। এটা ছোট বড় আবাল বৃদ্ধ বণিতা নির্বিশেষে স্থান কাল পাত্র সকল ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ব্যবহৃত হয়। ইসলামে সালাম কোন দেশ জাতি কিংবা কোন দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা বিশ্বজনীন। ইসলাম যেমন বিশ্বজনীন ধর্ম, মহানবী (সা.) যেমন রাহমাতুল্লিল আলামিন, সকল জাতি, সকল দেশ সকল মানুষের নবী তদ্রূপ তাঁর শিক্ষা সালাম ও বিশ্বজনীন। মুসলমান অমুসলমান সকল ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য হতে পারে। হযরত উসামা ইব্নে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, “একদা হযরত রসূল করীম (সা.) এমন এক জনপদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলমান ও মুশরীক তথা পৌত্তলিক ও ইহুদি সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত ছিল। তিনি তাদেরকে সালাম করলেন” (মোয়াত্তা)। দেখা যাচ্ছে অমুসলমান কেউ সালাম দেয়ার শিক্ষা রয়েছে। কেননা আসসালামু আলাইকুম এর অর্থ তোমার বা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। কেননা কারো প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত না হলে কেউই ঈমান এনে খাঁটি ঈমানদার হতে পারে না। সুতরাং দেখা সাক্ষাতে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে এই দোয়া বিনিময় করে সাদর সম্ভাষণ জানানো ইসলামের বিধান। এর মধ্যে রয়েছে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা বন্ধুত্বপূর্ণ ভালবাসা, মঙ্গল কামনা, হিংসা বিদ্বেষ গর্ব অহংকার বিবর্জিত বিনয়ীভাব। এর মধ্যে রয়েছে অন্তর্নিহিতভাবে বহু সন্ধানে নিগূর তত্ত্ব। পবিত্র কালামে আল্লাহ্ পাক বলেন, “হে ঈমানদারগণ! যারা ঈমান এনেছো তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যের ঘরে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঘরের অধিবাসির অনুমতি নেবে এবং তাদেরকে সালাম করবে” (সূরা নূর)। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, “তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান গ্রহণ কর। আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পরস্পরকে ভালবাস। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলব না যা দ্বারা তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি করে? নিশ্চয়ই বলবো, আর সেটা হল তোমরা পরস্পরের মধ্যে ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন করবে” (মুসলিম)। তিনি আরো বলেছেন, “যখন কোন মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাত হয় তখন তাকে সালাম করবে এরপর যদি তাদের মাঝে বৃক্ষ, প্রাচীর কিংবা পাথরের আড়াল হওয়ার পর পুনরায় সাক্ষাত হয় তখন আবারও সালাম দিবে” (মেশকাত)। সালামের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে লুকিয়ে আছে গূরতত্ত্ব ও আকর্ষণীয় শক্তি। যা মানব মনের সকল প্রকার হিংসা মনোমালিন্য দুর করে কাছে

টেনে এনে ভ্রাতৃত্ব প্রেম প্রীতি ও ভালসার বন্ধনকে দৃঢ় করে। কোন মজলিসে, কোন অনুষ্ঠানে কারো ঘরে এমনকি আপন ঘরে স্ত্রীর কামরায় প্রবেশকালে সালাম দেয়া ইসলামের বিধান। এতে অন্তর্নিহিত ভাবে গভীর তত্ত্ব রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন কোন মজলিসে পৌঁছে তখন সে যেন সালাম করে এবং সেখানে বসার প্রয়োজন হলে বসবে। অতঃপর যখন সেখান থেকে প্রস্থান করবে তখন বিদায়ী সালাম করবে (তিরমিযী ও আবু দাউদ)। হযরত আবু উসামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "তিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দায়িত্বে রয়েছে, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে বের হয়েছে। যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাকে উঠিয়ে নেন এবং বেহেশ্‌ত দান করে অথবা তাকে যাওয়ার বা গনিমত সহ ফিরিয়ে আনেন এবং যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করেছে, ও যে ব্যক্তি সালাম সহকারে তার ঘরে প্রবেশ করেছে" (আবু দাউদ)। হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "কথাবার্তা শুরু করার আগেই সালাম করবে" (তিরমিযী)। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, আগে সালাম প্রদানকারী অহংকার থেকে মুক্ত (বায়হাকী)। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি হযরত রসূল করীম (সা.)কে জিজ্ঞাসা করল ইসলামের কোন্ কাজ সর্বোত্তম। উত্তরে হুযূর (সা.) বললেন, ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং চেনা অচেনা সকলকে সালাম করা (বুখারী ও মুসলিম)। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, তোমরা ছোট, বড়কে, পথিক জনগোষ্ঠীকে এবং কম সংখ্যক বেশি সংখ্যককে সালাম করবে (বুখারী)। ইসলামে ছোট বড় ধনী দরিদ্র সকলের ক্ষেত্রে যেমন সালাম প্রযোজ্য তেমনি সকাল বিকাল দিবা রাত্র সকল সময় সালাম প্রযোজ্য, ছোট দিবে বড়কে, বড়রা দিবে ছোটকে, ছাত্র দিবে শিক্ষককে, শিক্ষক দিবে ছাত্রকে, স্বামী দিবে স্ত্রীকে, স্ত্রী দিবে স্বামীকে। ইসলাম সালাম মোসাফাহা আলীঙ্গন বা কোলাকুলি বৈধতা কেবল স্বীকৃত। ইসলামে পায়ে হাত দিয়ে কদমবুচি করার কোন বিধান নেই।

পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "কোন লোক তোমাকে সালাম করলে তাকে বলো না যে তুমি মুমিন নও" (সূরা নিসা)। কেউ যদি সালাম দেয় এবং নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় প্রদান করে তাহলে, তাকে কখনো অমুসলমান বলা যাবে না। সালাম হল পরস্পরের মধ্যে প্রেম প্রীতি বন্ধুত্ব ভালবাসা, শান্তি কল্যাণ ও নিরাপত্তার প্রতীক, এটা সকল অভিবাদন পদ্ধতির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। এক মুসলমানের প্রতি আরেক মুসলমানের হক বা দাবী রয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো দেখা সাক্ষাতে পরস্পর সালাম বিনিময় করা। ইসলামের শিক্ষানুসারে সালাম হলো দায়ী ইলাল্লাহ্‌র হাতিয়ার স্বরূপ। সালাম পরকে আপন করে দূরকে নিকটে টেনে আনে। সালামের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ, গর্ব অহংকার প্রতিষেধক ঔষধ রয়েছে। সালামে নম্রতা, ভদ্রতা ও বিনয়ীরূপে উৎকৃষ্ট স্বভাব চরিত্র গড়ে তোলে। এটা হলো একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গঠনের সর্বোত্তম পদ্ধতি। কোন ব্যক্তির সাথে যতবার দেখা সাক্ষাত হবে ততবার সালাম দেয়া ইসলামের বিধান। মহিলাগণও পুরুষদের সালাম দিতে পারে এবং পুরুষগণও মহিলাগণকে সালাম দেয়া বৈধ। চিঠি পত্রের মাধ্যমে বাহকের মারফত পারস্পরিক একে অপরের জন্য শান্তি নিরাপত্তা ও কল্যাণ কামনা করে সালাম বা দোয়া করার পদ্ধতি ইসলাম শিখিয়েছে। বর্ণিত আছে যে, হযরত বছরী (রা.) এর কাছে কোন এক ব্যক্তি তার দাদার কাহিনী বর্ণনা করেন যে, তার পিতা তাকে হযরত রসূল করীম (সা.) এর নিকট পাঠালেন এবং বললেন, তাঁকে আমার সালাম জানাবে তখন আমি হযরত রসূল করীম (সা.)-এর খেদমতে এসে বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তখন হযরত রসূল করীম (সা.) বললেন, তোমার ওপর এবং তোমার পিতার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক (মিশকাত)। দেখা যাচ্ছে যে, লোক মারফত শান্তি নিরাপত্তা ও কল্যাণ কামনা করে সালাম আদান প্রদান করা যেতে পারে। আজ ঘরে বসে পৃথিবীর যে কোন দেশের লোকদের সাথে সালাম বিনিময় করা যায়। এটা মহান খোদা তাআলার অপার কৃপা।

সালামের ব্যাপারে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের প্রতিষ্ঠাতাও জোড় তাগিদ দিয়েছেন এবং তাঁর খলীফাগণও এই বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করেছেন আর বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)ও ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন করার জন্য বার বার আমাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছেন। অতএব আসুন আমরা ব্যাপকভাবে একে অন্যের মধ্যে বেশি বেশি সালামের প্রচলন করি আর। আল্লাহ্‌র রহমতের ভাগী হই।

প্রসঙ্গ ঃ দোয়া

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী

নিজের এবং অন্যের অথবা বিশ্বের তাবৎ সৃষ্টির জন্য খোদার দরবারে সর্বপ্রকার কল্যাণে দোয়া যাচনা করার প্রথাকেই বলে দোয়া। এই দোয়া মহান রসূল (সা.) ও পরম সত্তা খোদার সেখানো বাক্য দ্বারা কিংবা স্বীয় ভাষার শব্দ চয়নেও করা যায়। যারা বোবা অর্থাৎ কথা বলতে অপারগ তারা তাদের হৃদয়ে উদিত ইচ্ছাগুলিকে নিঃশব্দ প্রকাশ দ্বারাও খোদা সমীপে ধ্যান মগ্ন হয়ে এ কাজটি সম্পাদন করতে পারে। পাপী, তাপী, পুণ্যবান, অধম-নরাধম, পন্ডিত, যুবক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, নিঃস্ব কিংবা জমিদার সকলের জন্যই এই প্রথায় যাচনার পথটি উন্মুক্ত। এই কাজের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কারো জন্যেই কোন বাধা নেই। খোদার কাছে অহোরাত্র দোয়া করা প্রতিটি মানুষের মৌলিক দায়িত্ব ও একান্ত কর্তব্য। এর জন্য কোন সময় অসময় নেই। চিন্তা-প্রস্তুতি কিংবা ভাবনার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কেবল নির্মল ও কাতর চিত্ত, এতে অশ্রু যত বিসর্জন দেয়া যায় ততই উত্তম, এই বৈশিষ্ট্যটি-ই দোয়া কবুলিয়তের প্রধান শর্ত, এই কাজে অবতীর্ণ হয়ে প্রশ্ন করা যাবে না যে কতক্ষণ কাঁদবো, কতটুকু কাঁদব, কার জন্য কী বলে কাঁদবো, কেন কাঁদবো। সকলের জন্য সম কামনায় স্বীয় অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে কেবল কেঁদে যাওয়াই দোয়াকারীর কাজ, কবুল করা হলো খোদার কাজ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "দুনিয়াতে যা কিছু সম্ভব কেবল দোয়ার দ্বারাই সম্ভব।" সুতরাং যেখানে দোয়া নেই সেখানে কোন কিছু নেই। সেখানে সবকিছুই অচল, সবকিছুই অসার। আপনি দোয়া করেন না তবে তো আপনি কিছুই করেন না। আপনি বিশ্বাস হননকারী, কারণ আপনি বলেছেন যে, আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন অথচ আপনি তেমনটি করেন না। যদি তা না করেন তবে আপনি ওয়াদা ভঙ্গকারী, আপনি অলস, নির্জীব ও অসচেতন আহমদী। আপনি জামাআতের মর্যাদাকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। বলা যায় আপনি অহংকারী। তাই আপনি দোয়া করেন না। আপনি ধারণাও করতে পারেন নাই যে, দোয়া আমাদেরকে কী দিতে পারে, কী করতে পারে। দোয়ার শক্তি কত প্রবল। এই জন্যই আপনি দোয়াতে অমনোযোগী।

দোয়া মানুষকে খোদার নৈকট্যে পৌঁছায়, খোদার আরশকে কাঁপায়, মনকে নির্মল করে, চিত্তে আনন্দ যোগায়, ভাবনাকে পবিত্র করে আর ভাগ্যকে সমৃদ্ধ করে। বিপদ বিপত্তিকে বিদূরিত করে। হতাশাকে আশায় পরিণত করে। অসম্ভবকে সম্ভবে ও অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করে, দোয়াকারী ঘুমিয়ে থাকে কিন্তু শ্রবণকারী খোদা তার জন্য জাগ্রত থাকেন, দোয়াকারী মনে করেন তিনি শূন্য কিন্তু প্রতিদানকারী খোদা তাকে করেন ধন্য। দোয়া পাপকে ভস্ম করে আর পাপীকে মহান করে। দুনিয়ার কেউ জানে না আর কেউ যা বলতে পারে না দোয়াকারী তা জানেন এবং তা তিনি বলতে পারেন। দোয়া প্রজ্জ্বলিত বহ্নি কুন্ডকে সুশীতল জলে পরিণত করে। কে হযরত ইবরাহীম (আ.)কে অগ্নিদাহ হতে রক্ষা করেছিলেন? কে হযরত নূহ (আ.)কে প্লাবনে ভাসতে ও মূসা (আ.)কে সাগর জল পাড়ি দিতে সাহায্য করে ছিল? এর প্রত্যেকটাই ছিল দোয়ার দান।

দোয়া মানুষের আত্মাকে আম্মারার স্তর হতে মুৎমাইন্নাহ্র স্তরে উপনীত করে এবং ইলমুল একীনকে হাক্কুল একীনে দর্শন করায়। দোয়া মনকে নির্মল করে, ভয়কে সাহসে পরিণত করে ও আত্মাকে আধ্যাত্মিক জগত গ্রহণে আগ্রহী করে। দোয়া কাঠিন্যকে সহজ, দুর্লভকে সুলভে ও দুঃসাধ্যকে সাধ্যে নিয়ে আসে। বিপথগামীকে সুপথে পারিচালিত করে ও নির্মম শত্রুকে পরম বন্ধুত্বে পরিণত করে এবং পৃথিবী কর্তৃক বিকৃতজন খোদা কর্তৃক স্বীকৃতি সমর্থ হন। মানব চিন্তা যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যায় দোয়া সেখানে তার আরো দুর গমনের নব দ্বার খুলে দেয়। অতঃপর অবাক বিস্ময়ে বলতে হয়, হায়! তা কী করে সম্ভব হলো? কে একাজে এত সফলতা দান করল। এরূপ অসম্ভব অলৌকিক ঘটনা ঘটানোই দোয়ার কাজ। দোয়ার দ্বারা সাধিত কর্ম সকলের জন্য সম কল্যাণকর হয়। সকলে সমহারে এর উপকার লাভ করে। যিনি দোয়ার ফয়সালায় যত সন্তুষ্ট তিনি খোদার কাছে তত সন্তুষ্ট, তিনি খোদার কাছে তত প্রিয়। দোয়া যাচনাকারী একদিন মৃত্যুবরণ করেন বটে কিন্তু আত্মা তার অমর হয়ে থাকে। তিনি খোদার কাছে হেঁটে যান কিন্তু খোদা তার কাছে দৌড়ে আসে। তিনি খাদ্যের কথা ভুলে যান কিন্তু খোদার সাহায্য তার জন্য খাদ্য নিয়ে হাজির থাকে।

দোয়া এমনতর অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমরা যারা সেই দোয়ায় রত থাকি না, দোয়া করতে আগ্রহ প্রকাশ করি না যে এমতাবস্থায় খোদা আমাদের পাশে থাকবেন। বরং তিনি আমাদের পরিত্যাগ করে দূরে সরে যাবেন, এটাই বাস্তব। তাই খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েই বলেছেন "আপনারা দোয়া করুন, দোয়া করুন এবং আরো দোয়া করুন, তাঁর (আই.)-এর প্রথম ইচ্ছাটিই ছিল জামাআতকে

দোয়ায় আশক্তি করা, দোয়াই তখন তাঁর একান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ দোয়াই হলো আমাদের সকল সম্ভবের হাতিয়ার এবং সকল কল্যাণের উৎস। মাছ পানি ছাড়া বাঁচে না, মানুষও দোয়া ছাড়া বাঁচতে পারে না, যে দোয়া করে না সে জীবন মৃত। সুতরাং আমরা যারা দোয়া করি না আসলে আমরা কিছুই করি না, না নিজের জন্য না অন্যের জন্য।

হে বন্ধুরা! আমি ধারণাই করতে পারি না যে, আপনি আমার জন্য কিংবা আপনার নিজের জন্য দোয়া করেন না। সুতরাং তা হলে আপনি আমার জন্য কিছুই করেন না। কারণ দোয়াই তো কেবল আপনার কাছে আমার একমাত্র চাওয়া। অথচ এই সহজ কাজটিই আপনি আমার জন্য করেন না। আপনি বলবেন, আপনি আমাকে লক্ষ টাকা দান করেছেন। আসলে আপনি আমার জন্য কিছুই করেন নাই। কারণ আপনি আমার জন্য দোয়া করেন না। আপনি কি করে আশা করতে পারেন যে, আপনার দেয় এই অনুদানটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট? মোটেই তা নয়। এ তো নস্যি তুল্য। আমার সম্পদ, আমার সুনাম ও সমৃদ্ধি আমার ধন-দৌলত, মান-সম্মান ও সুখ-শান্তি আমার ঈমান আমল এর সবই আমার হবে কেবল আপনার দোয়ার বদৌলতে। নচেৎ এ কিছুই আমার হবে বলে আমি আশা করতে পারি না। আমরা কোন ভাবেই আশা করতে পারি না যে, খোদা আমাদেরকে অঢেল দিবেন অথচ আমরা এই উদ্দেশ্যে দোয়া করব না। এরূপ কল্পনা কোনভাবেই সত্য নয়। বরং সকঠিন সত্য হলো, আমাদের জীবনের ক্ষণিক মুহূর্তটিও নিরাপদ নয় যদি বা আমরা দোয়া না করি। আমার নিজের ও আমার সন্তান-সন্ততি ও আমার পিতা মাতার জীবন ও তাঁদের সুখ-শান্তিসহ সকল কল্যাণ কেবল আমাদের পরস্পরের দোয়ার ওপর নির্ভর, অথচ সেই দোয়ার কাজেই আমরা উদাসীন তা বলে জামাআতের ভিত আমরা কীভাবে মজবুত হওয়ার আশা করতে পারি। আমাদের উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়ার কাজে সফল হতে পারি? আমরা তো সদা সর্বদা দোয়া করতে দোয়ার ওপর নির্ভর থাকতে এবং সকলকে দোয়ায় অনুপ্রাণিত করার শর্তে খোদার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে আছি, সুতরাং যদি আমরা সেই শর্তে শিথিল হই তবে খোদার কুপানল অবশ্যই আমাদেরকে দাহ করবে। কারণ খোদা প্রদত্ত শর্ত হলো , **"কুল মা ইয়া'বাওবিকুম রাব্বি লাওলা দোওয়াউকুম"**–অর্থাৎ তুমি বলে দাও (হে মুহাম্মদ) যদি তোমরা দোয়া না কর তবে আমার প্রভু তোমাদের কী পরওয়া করেন?' (সূরা আল ফুরকান)। এই শর্তমূলে আমরা যারা দোয়া করার অঙ্গীকারে জামানার মসীহ্ (আ.)-এর দলভুক্ত হয়েছি তারা নিঃসন্দেহে খোদার কাছে নিন্দিত হবো যদি বা আমরা এই দোয়ার কাজে বিন্দু বিসর্গ শৈথিল্য প্রকাশ করি। আমরা প্রত্যেকেই জাগতিক সম্পদ সম্ভার অর্জনের ক্ষেত্রে সত্যিকার ব্যস্ত থাকি যা কি না দোয়া করার ক্ষেত্রে হওয়া উচিত ছিল। কেননা আমি আপনার জন্য আর আপনি আমার জন্য আমরা কেউ কিছু করতে পারি না, কেবলই দোয়া দান ব্যতীত। এই অনুদানই আমাদের একে অপরকে দেয়া আমাদের জন্য সহজ ও উত্তম। সুতরাং এই দান প্রাপ্তিতে আমরা যেন কোনভাবেই কেউ বঞ্চিত না হই তৎপ্রতি দৃঢ়তার সাথে সচেতন থাকা উচিত। আমরা কি করে আশা করতে পারি যে, আপনার আমার সন্তান ও তাদের বংশধর নিরাপদে থাকবে। খোদার কল্যাণে মহিমান্বিত হবে, জীবনের উন্নততর শিখরে পদার্পন করবে। নিষ্কলুষ নিন্দাহীন জীবনের অধিকারী হয়ে খোদার পুরস্কার প্রাপ্তদের সামীল হবে? এর কিছুই হবে না যদি না আমরা তাদের জন্য দোয়া করি। সেজদায় ক্রন্দন রত হয়ে অশ্রু নিপাত না করি। খোদা তাঁর এমন বান্দাদের আমলেই আনেন না যারা কিনা দোয়ার কাজে অহরহ বিনীত না থাকে, যারা যুগের মসীহ্ (আ)-কে চিনেনি তারা ভ্রমে নিপতিত, তারা উদাসীন, তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা জানে না যে, দোয়া কী আর এর শক্তি কত প্রবল এবং এর দ্বারা কত কী করা সম্ভব। তাই তারা দোয়া করে না এবং এর মর্মার্থও বুঝে না, আমরা কিন্তু সেই তাদের দলের নই।

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ!

আমরা খোদার কাছে দ্বি-দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ। নিজেকে তো দুনিয়াবী ঝঞ্জাল থেকে বাঁচাতে হবে সাথে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ছুটে চলা খোদা বিমুখ মানুষগুলোকেও আলোর পথে চালিত করে আধ্যাত্মিক জীবন দান করতে হবে। তারা হয়ত ভাবছে তাদের বুদ্ধি বলে তাদের অর্থের জোকে কিংবা বিজ্ঞানের কৌশল খাটিয়ে জগতকে শান্তির বাসভূমিতে পরিণত করে এবং তাদের অসাধারণ সমস্যাগুলির সমাধান করবে, তাতে দোয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর সবই ভুল। আর এই ভুল আমাদেরকেই ভাঙ্গতে হবে। তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, দুনিয়াতে যা কিছু সম্ভব কেবল দোয়ার দ্বারাই সম্ভব, সাথে চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। তবে তা হতে হবে দোয়ারই মাধ্যমে, নতুবা আদৌ তাতে ঐশী সাহায্য যুক্ত হবে না। তাই আসুন, দোয়া করি এবং সকলে মিলে দোয়া করি। নিজের জন্য তো বটেই, প্রতিটি আহমদী পরিবার ও বিশ্ব মানবের জন্য। এই অভিযানে আমরা অবশ্যই সফল হবো। কেননা আমাদের খোদা আমাদের সাথে আছেন।

খিলাফতের মহান উদ্দেশ্য

মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান খোদা তাআলা এই পৃথিবীতে যে উদ্দেশ্যে নবী রসূল পাঠিয়েছেন, সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তব রূপ ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করাই খিলাফতের উদ্দেশ্য। কারণ নবী রসূল তো আর শত বছর জীবিত থাকেন না, তাঁর কাজকে জগতে সঠিক রূপে প্রতিষ্ঠা করতে হলে শত শত বছরের প্রয়োজন, তাই নবীর মৃত্যুর পর সেই কাজ ধারাবাহিক ভাবে একের পর এক খলীফারাই জগতে পূর্ণতা দান করে থাকেন। এক কথায় বলা যায়, নবীর যে উদ্দেশ্য, ঠিক একই উদ্দেশ্য খলীফার। নবীর কাজই খলীফার কাজ। যেমন নবীর কাজ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সুরা আল্ জুমুআ–৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে **"তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদেরই মধ্যে থেকে এক রসূল আবির্ভূত করেছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃতি করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।"**

নবী রসূলদের পৃথিবীতে পাঠানোর মহান উদ্দেশ্যই এই আয়াতে বর্ণীত হয়েছে। আর এইসব সেই মহান দায়িত্ব, সেই সুমহান কর্তব্য যা সম্পাদন করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে কয়েক হাজার বৎসর পূর্বেই এক অসামান্য গুণসম্পন্ন মহানবীকে আরবদের মধ্যে প্রেরণের প্রার্থনা করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পুত্র ইসমাঈল (আ.) সহযোগে সেই সুদূর অতীতে যখন কাবা শরীফের ভিত্তি উঁচু করে গড়ছিলেন, তখনই তিনি এই সুদূর প্রসারী দোয়াও আল্লাহ্ তাআলার সমীপে পেশ করেছিলেন। প্রকৃত কথা এটাই যে, কোন সংস্কারকই নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে না, যদি না তিনি স্বকীয় পূতপুণ্য দৃষ্টান্ত ও পবিত্র উদাহরণ দ্বারা এমন এক সরল, ভক্ত ধার্মিক ও প্রাণোৎসর্গকারী সম্প্রদায় বা জামাআত সৃষ্টি করে নেন, যারা তাঁর আদর্শ ও নীতির ছাঁচে গড়ে উঠে এবং তাঁর বাণীর মর্মকথা, দর্শন, তাৎপর্য, যুক্তি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে সকলের কাছে তা প্রচার করার মত আগ্রহ, যোগ্যতা ও নিষ্ঠা অর্জন করে নেয়। সংস্কারক তাঁর অনুগামী সম্প্রদায়কে এমনভাবে শিক্ষা দান করে থাকেন যে, অনুসারীদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও পবিত্র হয়ে উঠে, তাদের ধর্ম বিশ্বাস সঠিক, সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত হয়। তাঁর পবিত্রতম দৃষ্টান্ত ভক্তদের হৃদয়ের সকল পঙ্কিলতাকে দূরীভূত করে পবিত্রতাকে শতগুণে বৃদ্ধি করে দেয়। (তথ্য-আহমাদীয়া মুসলিম জামাতের বাংলা তরজমা কুরআনের সুরা জুমুআ–৩ আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে)।

এই আয়াত থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি, একজন নবীকে আল্লাহতাআলা কি দায়ীত্ব দিয়ে পাঠান। উপরোক্ত আয়াতে যেমন বলা হয়েছে রসূলের কাজ হল-অজ্ঞদেরকে আল্লাহর বাণী যেন শুনানো হয়, এবং হিকমত যেন শিক্ষা দেয়, অর্থাৎ সকল জ্ঞান যেন শিক্ষা দেয়া হয়। আমরা তো খলীফার মাঝেও একই বিষয় দেখতে পাই। তারাও খোদা তাআলার বাণী লোকদের শুনিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করেন। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা বুঝান। যুগ অনুযায়ী দিক নির্দেশনা দেন। কিভাবে চললে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে তার শিক্ষা দেন।

তাই আমরা বলতে পারি আল্লাহ তাআলা নবী রসূলদের আদর্শ ও নমুনার প্রবাহকে জারী রাখার জন্য তাঁদের মৃত্যুর পরে এমন স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন যাদের মাধ্যমে নবী-রসূলদের আদর্শ ও তাঁদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে থাকে। নবী-রসূল এবং খলীফাদেরকে আল্লাহ তাআলা একইভাবে যে সমর্থন করে থাকেন তা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করছি।

সত্য 'মামুর' বা প্রত্যাদিষ্টের যথা সময়ে আবির্ভাব ঃ

'মামুর' বা প্রত্যাদিষ্টের আবির্ভাব মানবতার যথার্থ প্রয়োজনের সময়ে হয়ে থাকে। যুগের অবস্থান সাক্ষ্য দিতে থাকে যে, কোন 'মামুর মিনাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ, কোন 'মুসলেহ্ রাব্বানী' অর্থাৎ ঐশী ধর্ম-সংস্কারক আবির্ভূত হওয়া অত্যাবশ্যক। যুগ অবস্থার উচ্চ কণ্ঠোচ্চারিত এইরূপ সাক্ষ্য প্রত্যেক নবীর সময়েরই বিশেষত্ব। তেমনি নবীর মৃত্যুর পর নেতৃত্বের অভাবে সবাই হতাশায় চিন্তিত থাকেন, তাই জাতির প্রয়োজনে নবীর কাজকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা নবীর খলীফা মনোনীত করেন।

প্রত্যাদিষ্টদের বিরোধিতা ঃ

‘মামুর’ বা প্রত্যাদিষ্টকে আল্লাহ তাআলা যখন পাঠান, তখন ধর্ম-বিরোধী ব্যক্তিরা ও তথা কথিত ধর্ম সমর্থকরা অপরিহার্যভাবে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তুমুল বিরোধীতা চলে। এই বিরোধিতায় তারা চরম সীমা ছাড়িয়ে যায়। এমন কী প্রত্যাদিষ্টদের হত্যা পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়। ঠিক তেমনি খলীফারও চরম বিরোধীতা হয়ে থাকে।

প্রত্যাদিষ্টদের বিরোধিতা ও শত্রুদের ব্যর্থতা ঃ

আমরা সকল নবী রসূলের ইতিহাস পাঠে জানতে পারি, সর্বাবস্থায় খোদাতাআলা নবী রসূলদের বিরুদ্ধবাদিদেরকে অকৃতকার্য ও ব্যর্থ করেছেন এবং নবী রসূলদের মহান বিজয় দান করেছেন। সব সময় নবী রসূল অহর্নিশ বিজয় ও ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকেন। তদ্রূপ খলীফাদেরকেও আল্লাহ তাআলা বিরুদ্ধবাদীদের সকল চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করে বিজয় দান করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন। আমরা শত বছর ধরে আহমদীয়া জামাআতের খলীফাদের বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থা দেখেছি, তারা প্রত্যেকে লাঞ্ছিত ও অপমৃত্যুর করুন পরিণতি ভোগ করেছে। অপরদিকে জামাআতকে দ্রুত উন্নতি দান করছেন খোদা তাআলা।

গায়েবের সংবাদ লাভ ঃ

নবী রসূলদের যেমন আল্লাহ তাআলা ভবিষ্যতের সংবাদ দান করেন এবং বড় বড় সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্বন্ধে ঘটনার পূর্বে ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে সংবাদ দান করেন, তেমনি আল্লাহর মনোনীত খলীফাগণও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে জাতিকে বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করে থাকেন। খলীফাদের গায়েবের সংবাদের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত শত শত বছর ধরে আমরা অনেক দেখেছি।

প্রত্যাদিষ্টদের ঐশী সাহায্য ঃ

মহান খোদা তাআলা প্রত্যাদিষ্টদের সর্বদা ঐশীভাবে সাহায্য করে থাকেন। তাঁদেরকে সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন এবং খোদা তাআলার রহমতের চাদরে ঢেকে রাখেন। সর্বক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় তাঁদেরকে ঐশী সাহায্যে জয়ী করেন। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর মনোনীত খলীফাকেও খোদাতাআলা সর্বদা ঐশী সাহায্য প্রদান করেন।

প্রত্যাদিষ্টদের পবিত্রকরণ ক্ষমতা ঃ

নবী রসূলদের মধ্যে মানুষকে পাক-পবিত্র করবার মহান শক্তি আল্লাহ তাআলা দান করেন। তাঁদের সঙ্গ লাভের কল্যাণে অতি বিকৃত ব্যক্তিরাও একান্তই সৎ হয়ে যায়। আরবের বন্যতুল্য মানুষ যেভাবে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাবে ফেরেস্তা তুল্য হয়ে গিয়েছেন, এমনই পবিত্রকরণ শক্তি নবী রসূলদেরকে আল্লাহ তাআলা দিয়ে থাকেন। আর খলীফাদেরকেও আল্লাহ এই পবিত্রকরণ শক্তি দান করেন। আজ আমরা দেখছি, আহমাদীয়া জামাআতের খলীফাদের কল্যাণেও কোটি কোটি পথহারা মানুষ সঠিক পথ লাভ করছে, জীবনে আসছে আমূল পরিবর্তন, জ্ঞানান্ধরা ফিরে পাচ্ছে দৃষ্টি শক্তি।

ঐশী গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ঃ

নবী রসূলরা আল্লাহর কিতাবের সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভ করেন, জাগতিক দিক থেকে তারা যতই মামুলী শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন না কেন, ঐশী জ্ঞানে তারা আলেকিত থাকেন। তেমনি খোদা তাআলা কর্তৃক মনোনীত খলীফারাও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঐশী জ্ঞান লাভ করে থাকেন। বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন আপত্তির দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে বুঝিয়ে দেন–কে সত্য আর কে মিথ্যা।

আযাব অবতরণ ঃ

পৃথিবীতে যখনই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগত নবী রসূলদের মিথ্যাবাদী, ভণ্ড প্রতিপন্ন করতে জাতি তৎপর হয় এবং বিরোধিতা কোন ক্রমেই নীচে নামে না, তখন কোন না কোন ঐশী আযাব অপরিহার্যক্রমে অবতীর্ণ হয়। যাতে তারা সত্যের দিকে আকর্ষিত হয় এবং কোন কোন সময় সম্পূর্ণ সীমাতিক্রম বশতঃ কোন কোন জাতি একেবারে ধ্বংস বা নিশ্চিহ্নও হয়। আজও সমগ্র পৃথিবীতে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে তাও যুগ খলীফাকে অস্বীকার করাই এক পরিণাম বিশেষ। নতুন নতুন ভাবে প্রলয়ঙ্করী আযাব পৃথিবীতে ধেয়ে আসছে, এসব তো যুগ খলীফাকে অস্বীকার করার ফলেই ঘটছে।

ভ্রান্ত ধর্ম সমূহের খণ্ডন ঃ

নবী-রসূলগণ সমকালীন যুগের যাবতীয় ভ্রান্ত ধর্মমত ও ভ্রান্ত ধর্মাবলীর খণ্ডন করে সঠিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং ভ্রান্তকে পরিত্যাগ করার জন্য সর্বদা সচেতন করেন। আর এই কাজ তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত করে থাকেন। আর খলীফাগণও যুগবর্তী সকল প্রকারের কুসংস্কার, শিরক, বেদাত, ভ্রান্ত কর্মের

খণ্ডন করে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

আল্লাহ্ তাআলার প্রতি অটল বিশ্বাস ঃ

মহান খোদা তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার ফলে সর্ব প্রথম ঈমানদার ব্যক্তি নবী রসূলগণই হয়ে থাকেন। তাঁদের এই ঈমান, এত দৃঢ় হয় যে, দুনিয়ার কোন শক্তি তা টলাতে পারে না। আমরা আল্লাহর মনোনীত খলীফাদের মাঝেও ঠিক তেমনি খোদা তাআলার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপনের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

প্রত্যাদিষ্টদের সমর্থন ঃ

সমাগত মামুর বা প্রত্যাদিষ্টদেরকে আল্লাহ তাআলা সকল কাজে সমর্থন দিয়ে থাকেন। তেমনি খলীফাদেরকেও আল্লাহ তাআলা তাদের সব কাজে সমর্থন প্রদান করেন।

আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক ঃ

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট 'মামুর' আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ উপস্থাপন করেন। তাঁদের জীবনের প্রত্যেক বিষয়ে, এবং প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁরা আল্লাহ্ তাআলার সাথে বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সম্পর্কের সর্বোত্তম আদর্শ প্রদর্শন করেন। ঘনিষ্ট অপেক্ষাও ঘনিষ্ট, গুঢ় থেকে নিগুঢ় গভীরতম কোন সম্পর্ক এর কাছে তুচ্ছ প্রমাণিত হয় এবং তৌহীদের উচ্চতম বিকাশ হয়। খলীফাগণও আল্লাহ তাআলার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেন।

সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি ঃ

খোদা তাআলার প্রেরীতরা সৃষ্ট জীবের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতিশীল হয়ে থাকেন। সৃষ্ট জীবের সেবায় তারা সর্বদা চিন্তিত থাকেন। তেমনি খলীফাগণও সৃষ্ট জীবের সেবায় সচেষ্ট থাকেন। সৃষ্ট জীবের দুঃখে তিনি দুঃখিত হোন, দোয়া করেন, কাঁদেন, তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগীতা করেন।

ঐশী গুণাবলীর বিকাশ ঃ

দয়া, প্রেম, বাৎসল্য, অপরের দোষাবরণে নবী রসূলগণ আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রদর্শন করেন, যার কোন তুলনাই হয় না। আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত যুগ খলীফাগণও তেমনি ঐশী গুণাবলীর বিকাশস্থল হয়ে থাকেন।

লজ্জাশীলতা ঃ

খোদা তাআলার 'মামুর'গণ অতি উচ্চ পর্যায়ের লজ্জাপরায়ণ হয়ে থাকেন। বিশেষতঃ কামলোলুপ দৃষ্টির অবদমন ও অদর্শনীয় হতে দৃষ্টি সংবরণার্থে জীবন্ত আদর্শ হয়ে থাকেন। যুগ খলীফরাও উচ্চ পর্যায়ের লজ্জাপরায়ণ হয়ে থাকেন।

সত্যিকার নির্লোভ ঃ

আল্লাহ তাআলার প্রেরীতগণ পার্থিব ধন-সম্পত্তির লোভে লোভী হন না। তাঁরা সর্বদা দানশীল হয়ে থাকেন। নশ্বর পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস, পার্থিব আকাঙ্খারাজি ও নীচাভিলাস থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ পবিত্র থাকেন এবং কখনও আসক্ত হন না। ঠিক তেমনি যুগ খলীফারাও হয়ে থাকেন।

ঐশী হেফাযত ঃ

আল্লাহ তাআলার প্রেরীতদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাই শত্রুর হাত থেকে হেফাযত করেন। সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন। ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ মনোনীত খলীফাদেরকেও তিনি ঐশী হেফাযতের চাদরে আবৃত রাখেন। শত্রুপক্ষ খলীফার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

ধর্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও ভয়ের পর নিরাপত্তা ঃ

আল্লাহ তাআলার 'মামুর' ও তার খলীফারা ধর্মকে দৃঢ়-রূপে সংস্থাপন করেন। এই সংস্থাপন কার্যের পথে যতই বাধার সৃষ্টি হোকনা কেন এবং এর বিপক্ষে আন্দোলনের আলোড়ন যতই প্রবল হোকনা কেন, তাঁদের জামাআত অর্থাৎ আল্লাহর মনোনীত জামাআত নিরাপত্তা, উদ্বেগহীনতা, স্বস্তি, শান্তি, অবিচল স্থৈর্য ও দৃঢ়তা লাভ করে। আল্লাহ তাআলা সকল ভয়-ভীতি দূর করে শান্তিতে রূপায়ীত করেন। যেভাবে প্রত্যেক নবী রসূলদের জীবনে আমরা দেখেছি, প্রথমে সাময়িকভাবে ভয়ভীতির অবস্থা সৃষ্টি হলেও পরে তা শান্তিতে পরিণত হয়েছে, তেমনি আল্লাহর মনোনীত খলীফাদের বেলাতেও এমনই হতে দেখা গিয়েছে যার ফলশ্রুতিতে খোদা তাআলার অনুগ্রহে আহমদীয়া খিলাফত সকল ভয়ভীতি দূর করে শত বছর পার করতে সক্ষম হয়েছে, আর কেউ এই খিলাফতের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ্।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অবশ্যই এটা বলতে পারি যে, নবী-রসূলদেরকে আল্লাহ্ তাআলা যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন ঠিক সেই একই উদ্দেশ্য খিলাফতের হয়ে থাকে। অর্থাৎ খিলাফতের উদ্দেশ্য ও নবী-রসূলদের উদ্দেশ্য অভিন্ন। তাই খলীফাদের কাজ নবী রসূলেরই কাজ ।

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার জন্য ভ্রমণ

মাকসুদা রহমান

'শিক্ষা' শব্দটির সঙ্গে সবাই পরিচিত। দু'টি অক্ষর বিশিষ্ট এ শব্দটি অনেক গুরুত্ববহ। শিক্ষা কি? এ সম্পর্কে পন্ডিতগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন, 'শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তোলে। কেউ বলেছেন–'ন্যায় অন্যায়, ভাল-মন্দ জ্ঞান দান করে শিক্ষা', আবার কারো মতে 'সভ্য ও ভদ্রভাবে চলার পদ্ধতি শিক্ষার মাধ্যমেই আয়ত্ব করা হয়।' এসব সংজ্ঞা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে,– শিক্ষা হলো মানুষের সর্বাঙ্গীন গুণাবলী ও জ্ঞান আহরণের মাধ্যম, পবিত্রতা অর্জনের উপায় বা পদ্ধতি।

আল্লাহ্ তাআলা শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কুরআন করীমে তিনি শিক্ষাকে 'আলো' এবং মূর্খতাকে 'অন্ধকার' বলেছেন। যারা শিক্ষার আলোতে আলোকিত তাদেরকে 'উৎকৃষ্ট জীব' বলা হয়েছে, অপর দিকে যাদের শিক্ষার আলো নাই তাদেরকে 'নিকৃষ্ট জীব এবং অন্ধ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা আদেশ করেছেন–"তুমি পাঠ কর কেননা তোমার প্রতিপালক পরম সম্মানিত, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে তা যা সে জানত না।" (৯৬ : ৪-৬)

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–'যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে'। (২ : ২৭০) তিনি আরো বলেন–'তুমি বল যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বস্তুত ধীসম্পন্ন লোকগণই কেবল শিক্ষা লাভ করে।' (৩৯ : ১০)

জ্ঞানার্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আল্লাহ্ তাআলা বান্দাকে দোয়া শিখিয়েছেন–'হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।' (২০ ; ১১৫) কুরআন পাকে বার বার শিক্ষালাভ সম্পর্কে তাগিদ করা হয়েছে।

শিক্ষালাভ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার আদেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নবী করীম (সা.) ঘোষণা করেছেন–"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর জন্য ফরজ।" (ইবনে মাজাহ্) –"যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষার পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন।" (মুসলিম) তিনি (সা.) আরো বলেছেন–"একজন বিশ্বাসীর জ্ঞান অন্বেষণ প্রচেষ্টা শেষ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জান্নাতে দাখিল হয়। (তিরমিযী)

আল্লাহ্ তাআলা শিক্ষাকে আলো বলেছেন, কারণ এ 'আলো' আঁধাররূপী সকল অজ্ঞতা, পঙ্কিলতা, অন্যায় অনাচার দূর করে দিয়ে মানুষকে সঠিক পথ অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যের অনুসারী করে। এক কথায় মানুষ হয় আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা! মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্যই কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষের মধ্যে মনুষত্ববোধ সৃষ্টি, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানার জন্য কুরআন পাকে দিকনির্দেশনা রয়েছে। কুরআন করীমের শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটেছে নবী করীম (সা.) এর পবিত্র জীবনে। তিনি মানুষকে এই শিক্ষার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাগিদ করেছেন তা গ্রহণ করতে, এর আলোতে আলোকিত হয়ে সুফল লাভ করতে। তাই নবী করীম (সা.) এঁর জীবনাদর্শ এবং তাঁর মুখনিসৃত বাণী মানুষের জন্য অবশ্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। কেননা মানব ধর্ম 'ইসলাম'কে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই নবী করীম (সা.) এঁর আবির্ভাব হয়েছে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কাছেই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

শিক্ষা মানুষকে আয়ত্ব করতে হয়। জন্মের পর থেকে শিশু তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে শিখতে শুরু করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে ও বংশগত ভাবে কতগুলো বিষয় শিশুর মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। বিশেষ করে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় মাতার অনেক আচরন ও আমল শিশুর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু সাধারণ অর্থে শিক্ষার যে সংজ্ঞা, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, জন্মের পর একটি সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করে 'শিক্ষা'। মানুষকে নীতিবান ও বিবেকবান করে তোলে 'শিক্ষা'। এ কারণে পূর্বে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তা

ছিল গুরুগৃহে অবস্থান পূর্বক শিক্ষা লাভ করা। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গুরুগৃহে অবস্থান করতে হতো। শিক্ষাগুরু শিক্ষার্থীকে দৈনন্দিন শিষ্টাচার, ধর্মীয় শিক্ষাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন। প্রাচীন ভারতেও এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থী শিক্ষাগুরুর শিষ্যত্ব লাভ করে সাহচর্যে থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রে পান্ডিত্যসহ চরিত্র গঠন, আদব-কায়দা ও ধর্মীয় শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। গুরুগৃহে শিষ্যের অবস্থানের মেয়াদ ছিল ৫ বৎসর থেকে ১০/১৫ বৎসরকাল। তখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। থাকলেও প্রথমে গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। তাই দেখা যায় বড় বড় মণীষিগণ ও জ্ঞানীগুণী পন্ডিৎবর্গ যাঁরা গত হয়েছেন তারা কোন না কোন গুরুর শিষ্য হয়ে জ্ঞান লাভ করেছেন। অনেক সময় দেখা গেছে যে শিষ্য গুরুকে ছাড়িয়ে গেছেন। তবে এ পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করাকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভ করা হয় বলে ধরা যায় না। ইসলাম এ পদ্ধতিকে সমর্থন করে না। কারণ এ পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল বিত্তবান, সামর্থ্যবান এবং কোন জ্ঞান-পিপাসুগণই এ ভাবে শিক্ষা লাভ করতে পারতো। এতে খুব অল্প সংখক মানুষ শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত, সিংহভাগ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হতো কিন্তু ইসলামই সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা দিয়েছে।

ইসলাম জ্ঞান আহরণের জন্য বিভিন্ন স্থানে গমনপূর্বক শিক্ষালাভকে একটি অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে তবে একে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা বলা হয় না। কেননা আল্লাহ্ তাআলা সন্তানের জন্য পিতামাতাকে আদর্শ শিক্ষক হিসাবে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে পিতামাতা হলেন তাদের নিজ নিজ সন্তানদের অভিভাবক। কাজেই জন্মের পর থেকে পিতামাতাই হলো সন্তানের শিক্ষাগুরু।

শিক্ষার্থী বড় হয়ে যখন ভ্রমণের উপযোগী হয় তখন তার বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধজ্ঞান আহরণের জন্য রসূল পাক (সা.) ভ্রমণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন,

(১) যে বিদ্যার অনুসন্ধান করে তার পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়।'

(২) যে বিদ্যার সন্ধানে বের হয়, ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে থাকে।'

(৩) জ্ঞানাহরণের জন্য সুদূর চীনে যাও, বুকে হামাগুঁড়ি দিয়ে পাহাড় অতিক্রম করতে হলেও সেথায় গমন কর।'–উল্লেখিত হাদীসগুলো দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে কোন শিশুর দ্বারা কিংবা ১০/১২ বা তারও অধিক বয়সের শিক্ষার্থীর পক্ষে এরূপ ভ্রমণ করা মোটেও সম্ভব নয়। তাই ভ্রমণ উপযোগী বয়সে এবং গুরুত্ববহ। এর মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করার পাশাপাশি মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রসূল করীম (সা.) শিক্ষার সাথে সাথে ভ্রমণের প্রতি এজন্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন যাতে শিক্ষার্থী এর মাধ্যমে অনেকগুলো বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে পারে। যেমন–

(১) আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট বিশাল প্রকৃতি স্বচক্ষে দেখে তাঁর অসীম ক্ষমতা এবং শৈল্পীক নৈপুণ্য সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে (২) উন্মুক্ত ও বিশাল অংশে বিচরণ করার ফলে ব্যক্তির মন ও চিন্তা-চেতনাও বিশাল হয় (৩) তার মনে এ চিন্তার উদ্রেক হয় যে পৃথিবীর তুলনায় সাগর-মহাসাগর কতনা বিশাল আর মহাশূন্য (আকাশ) এর চেয়েও অধিক বিস্তৃত যেখানে লুকায়িত আছে অজানা রহস্যের অফুরন্ত ভান্ডার যে সব তথ্য আজও মানুষের অজানা। (৪) সৃষ্টি কর্তার অসীম দক্ষতা, ক্ষমতা ও অপার মহীমা দর্শনে তাঁর প্রতি আনুগত্যে আপনা হতে মস্তক অবনত হয়। (৫) মানুষের জানবার, দেখবার ও শিখবার ইচ্ছা শক্তি আরো বৃদ্ধি পেয়ে তা প্রবল আকার ধারণ করে। (৬) মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টজীবের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। (৭) পৃথিবীতে বসবাসরত অন্যান্য জাতির সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে জানা ও দেখার পর নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ হয়। (৮) ভাল ও মন্দের বিচার শক্তি লাভ হয়। (৯) নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অন্যদের ছড়িয়ে দিতে অনুপ্রাণিত হয়। (১০) স্বদেশের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায় (১১) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের সঙ্গে জানাশোনা, ভাব বিনিময়, যোগাযোগ, লেনদেন ও ভালবাসার মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। সংক্ষেপে এগুলো হল শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে ভ্রমণের উপকারিতা ও সুফল।

শিক্ষার জন্য ভ্রমণ' এর পূর্ব পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী যতক্ষণ পর্যন্ত না শারীরিক ও মানসিক ভাবে ভ্রমণের উপযোগী হয় সে সময় তার শিক্ষা সম্পর্কে ইসলাম চমৎকার ও ফলপ্রসূ নির্দেশনা দান করেছে। সে শিক্ষা হলো 'সার্বজনীন শিক্ষা'। এ শিক্ষা সবার জন্য প্রযোজ্য। এ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধাও সবার জন্য প্রযোজ্য।

এতে কোন আচার অনুষ্ঠান নেই, ব্যয় বাহুল্যতাও নেই। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর যার সময়, সুযোগ ও সামর্থ থাকবে এবং মানসিক ও শারীরিক ভাবে ভ্রমণের উপযোগী হবে, কেবল সেই পারবে ভ্রমণ করে তার সুফল লাভ করতে। নিম্নে সার্বজনীন শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

সময় ও কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে সব কিছুরই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই আধুনিক যুগোপযুগী শিক্ষার ব্যবস্থাও ইসলাম কায়েম করেছে। এতে গুরুগৃহে যাওয়ার ব্যবস্থা না থাকলেও পরিবারই সে যান্ত্রিক যুগে কিভাবে একটি শিশু ছোটবেলা থেকে শিক্ষা লাভ করে একজন সত্যিকার মানুষ হিসাবে গড়ে উঠবে সে বিধি-বিধান বা নিয়ম কানুন কুরআন পাক এবং রসূল করীম (সা.) এর সুন্নাহর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। পুঁথিগত বিদ্যা অর্থাৎ তোতাপাখীর মতো মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে সনদ বা সার্টিফিকেট পাওয়া যায় বটে কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে যদি তার প্রতিফলন না ঘটে তবে সে শিক্ষার কোন মূল্যই থাকে না। 'শিক্ষা' এর অর্থ হলো 'আলো'। কাজেই যে শিক্ষা বা আলো অন্ধকার অর্থাৎ সকল প্রকার অজ্ঞতা দূর করতে ব্যর্থ হয় সে শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করা আর না করা একই সমান। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় আমাদের সমাজে বহুল পরিচিত প্রবাদ বাক্যটির কথা, যেমন–'বে আদবের লেখাপড়া যেমন সাপের ফণা ধরা'। প্রবাদ বাক্যটি দ্বারা এটাই প্রতিপন্ন হয় যে বেআদব কোন শিক্ষার্থী লেখাপড়া শিখে বড় মাপের একজন শিক্ষিত বেআদবে পরিণত হয়। সে সমাজের কোন উপকারে আসে না বরং সমাজ তার দ্বারা কলুষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ আদব-কায়দা, মান-মান্যতা ও শিষ্টাচার বিবর্জিত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি সত্যিকার মানুষ বলে গণ্য নহে। সে বিবেক-বিবেচনাহীন ও একগুয়েমী স্বভাবের হয় বলে কেউ তাকে ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করে না এবং তার প্রতি কারো কোন আস্থা থাকে না। তাই সে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ নামের অযোগ্য বলে সে আল্লাহ্ তাআলার কাছেও অপছন্দনীয়। কাজেই সত্যিকার শিক্ষা বলতে যা বুঝায় তা একমাত্র ইসলামই প্রদান করেছে। সুশীল সমাজও শ্রেষ্ঠ জাতি গঠনের ক্ষেত্রে এ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের বিকল্প আর কিছু নেই।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায়। শিশু বিজ্ঞানীরাও একই মত পোষণ করেছেন। এ সময়ে মায়ের আমল, চিন্তা-ভাবনা, ধর্মপরায়ণা ও সুষম খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি সব কিছুই গর্ভের সন্তানের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং তা শিশুর সঠিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাই এ সময় মাতাকে বিশেষ সচেতন থাকতে হয় এবং নিজের প্রতি যত্নশীল হতে হয়। কারণ অসৎ আমল, কুচিন্তা, ধর্মহীনতা ও অসম খাদ্য গ্রহণ দ্বারা সুস্থ ও পবিত্র শিশু জন্মলাভ করতে পারে না। রসূল করীম (সা.) তাই বলেছেন, সন্তান গর্ভে আসার পর থেকেই তার তরবিয়ত অর্থাৎ চরিত্র গঠন শুরু করা উচিত।

জন্মের পর শিশুর শিক্ষা পরিবারের আওতাভুক্ত থাকে। পরিবার ও তার পারিপার্শিক অবস্থা ভাল হলে শিশুর শিক্ষাও সঠিক এবং সুন্দর হয়। এখানে শিশুর শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে পিতামাতার ভূমিকাই প্রধান। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পূর্বে গৃহের পরিবেশই হলো শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন, যেখানে শিশুর সত্যিকার বুনিয়াদ গঠিত হয়। মাতাপিতার পরে এখানকার শিক্ষকগণ হলেন পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষাগুলো শিশু গৃহেই আয়ত্ব করে এবং তাতে অভ্যস্ত হয়। যেমন–দু'হাতে গ্লাস ধরে পানি পান করা, এক নিশ্বাসে পানি পান না করা, ভাত খাওয়ার সময় প্লেটের বাইরে ভাত পড়ে না যাওয়া, বিসমিল্লাহ্ বলে খাবার শুরু করা, খাবার শেষে 'শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্ বলা, বাড়ীতে মেহমান এলে তাকে সালাম দেওয়া, তার সাথে মুসাফা করা, বিদায় বেলা

একই ভাবে বিদায় জানানো, বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের আদর ও স্নেহ করা, দাঁত দিয়ে নখ না কাটা, কোন কিছুর জন্য বায়না না ধরা, নিজের কাজ নিজে করা, খেলার সাথী ও সহপাঠীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা, নিজের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, পড়ার টেবিল ও নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখা, মাকে সাহায্য করা, কারো প্রতি ঈর্ষা না করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা ইত্যাদি। এসব শিক্ষা লাভ করাই হলো শিশুর আসল তরবীয়্যত। এ ভাবে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো যা (অতি প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ) শিশু গৃহে আয়ত্ব করে পরবর্তীতে তার জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তিকালে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কাজেই গৃহশিক্ষকগণকে (পিতামাতা ও অন্যদের) হতে হবে বিশেষ সচেতন যত্নবান।

শিশু যখন কথা বলতে ও বুঝতে শিখে তখন থেকেই তার শিক্ষা শুরু করতে হবে। ব্যবহারিক শিক্ষাগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষা যেমন কলেমা তৈয়্যবা, খাওয়ার দোয়া, শোক্‌র আলহামদুলিল্লাহ্ বলা, যাযাকুমুল্লাহ্, আস্‌সালামু আলাইকুম ও সালামের উত্তর, ইত্যাদি শিখতে শুরু করবে। এ শিক্ষার ব্যাপারে মাতাই প্রধান ভূমিকা পালন করবেন। কারণ শিশু সর্বক্ষণ মায়ের সঙ্গে থাকে, মাকে সে খুব ভালবাসে এবং মায়ের কথামতো কাজ করে। এ সময়ে সে মায়ের প্রতি সবচেয়ে আস্থাশীল থাকে। শেখার প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য মাতা তাকে মমতা ও ভালবাসা দিয়ে, খেলার ছলে, মজার মজার গল্প বলে, তার পছন্দের জিনিষ উপহার দিয়ে তাকে আকৃষ্ট করবেন। মাতার সব কথা ও কাজের প্রতি শিশুকে আস্থাশীল হতে সচেষ্ট থাকবেন।

এ ভাবে ২-৩ বৎসর বয়স থেকে ৪-৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছোট ছোট প্রয়োজনীয় দোয়া, ২/১ টি ছোট হাদীস, আল্লাহ্‌র কিতাব ও ফিরিশ্‌তাগণের নাম শিখাবে। এ বয়সের শিশুরা প্রায়ই মা-বাবার সাথে আগ্রহ সহকারে নামায পড়ে। শিশুর এ আগ্রহকে উৎসাহিত করতে হবে যেন তার মধ্যে এ অভ্যাস স্থায়ী হয়ে যায়।

৬-৭ বৎসর বয়সে খাবার শুরু ও শেষ করার দোয়া, শোবার সময় ও ঘুম থেকে জেগে ওঠার দোয়া শিখাবে। খুলাফায়ে রাশেদীনের চার খলীফার নাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর খলীফাগণের নাম শিখাবে। এ বয়সে আরবী কায়দা 'ইয়াস্‌সারনাল কুরআন' যা জামাআত কর্তৃক রচিত ও মুদ্রিত হয়েছে তা পড়ে শেষ করবে। কুরআন করীমের ছোট ছোট সূরা যথা সূরা কাওসার, সূরা আসর ও সূরা ইখলাস মুখস্থ করাবে এবং ছোট ২/৩টি হাদীস ও নযম শিখবে। সাধারণভাবে পুরা নামায পড়তে জানবে।

১-৯ বৎসর বয়সে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে শুরু করবে। ছেলেরা আতফালুল আহমদীয়া আর মেয়েরা নাসেরাতুল আহমদীয়া সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হবে। ওযুর দোয়া, মসজিদের আদব-কায়দা এবং নিজ নিজ আহাদনামা শিখবে। এ সময়ে নামায পড়ার পদ্ধতি বা নিয়ম কানুন, অর্থসহ কয়েকটি হাদীস শিখবে। আরো শিখবে আল্লাহ্ তাআলার ৪/৫ গুণবাচক নাম।

৯-১০ বয়সে বাজামাত নামায পড়বে, অর্থসহ নামায পড়তে শিখবে, ২/১টি রোযা রাখবে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কতিপয় ইলহাম শিখবে। অর্থসহ মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার দোয়া শিখবে। কুরআন করীমের কতিপয় আয়াত ও সূরা মুখস্থ করবে। ওযুর দোয়া ও তায়াম্মুমের পদ্ধতি ও জানাযার নামাযের দোয়া শিখবে। রাস্তায় চলাচলের আদব-কায়দাগুলো আয়ত্ব করবে।

আমাদের দেশের শিশুরা সাধারণত: ৪/৫ বৎসর বয়সে গৃহ পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ে গমন করে। অনেক শিশুই প্রথম অবস্থায় স্কুলের পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। শিশু কি কারণে স্কুলে অস্বস্থি বোধ করে মাতা সে বিষয়ে জানতে সচেষ্ট হবেন এবং যে কারণে স্কুলে থাকতে বা যেতে না চায় তা নির্ণয় করে সমাধানের ব্যবস্থা নিবেন। শুধু তাই নয় অতি যত্ন সহকারে তার কাছে স্কুলের পরিবেশ ভাল লাগার জন্য সেখানে তার উপযোগী বন্ধু খুঁজে তার সাথে বন্ধুত্ব করে দিতে হবে। তার জন্য আকর্ষণীয় সুন্দর সুন্দর ছড়ার বই, রংপেন্সিল, ড্রইং বই, খাতা ইত্যাদি কিনে দিতে হবে। বিদ্যালয়ের শ্রেণী শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সন্তানের খোঁজ-খবর রাখতে হবে এবং শিশুর প্রতি মনোযোগী হয়ে তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তখন

দেখা যাবে শিশু আস্তে আস্তে স্কুলে যাওয়ার জন্য এবং নিজের পাঠ শিখবার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠছে। এ সময়ে মাতাকে সচেতন থাকতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে তার সন্তানের মধ্যে বিরূপ কোন পরিবর্তন ঘটছে কিনা। কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলে সঙ্গে সঙ্গে যত্নসহকারে এবং হেকমতের সাথে তা সংশোধন করতে সচেষ্ট হবেন।

শিশুরা স্বভাবত: অনুকরণ প্রিয় হয়ে থাকে। তার কাছের মানুষ যারা তার প্রয়োজন তাদেরকে সে যা করতে দেখে, বলতে শুনে সে তাই অনুকরণ করে। তাদের চাল-চলন, কথা-বার্তা, কাজ-কর্মসহ কোন কিছুই বাদ যায় না। কাজেই তার কাছের মানুষ ও আপনজন হিসেবে প্রথমে মাতা ও পরে পিতা এবং তার পরে পরিবারের অন্যান্যদেরকে বিশেষভাবে অনুকরণ না করে। তাই তাদের চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ যেন ভাল-সুন্দর ও সঠিক হয় সে ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হবেন। তাদের মধ্যে ঝগড়া ফ্যাসাদ হবে না, শিশুকে মিথ্যা প্রলোভন দেখানো যাবে না, কথা মতো কাজ করতে হবে, সব সময় সত্য কথা বলতে হবে, সময় মত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে, প্রত্যহ কুরআন পাঠ করতে হবে, শিশুর সাথে কটো কথা বলা যাবে না এবং কঠোর ব্যবহার করা যাবে না, নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে, বয়োজোষ্ঠদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে, বাড়ীর কাজের লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে, পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে এবং প্রতিবেশীদের সাথে মিলে মিশে চলতে হবে। এছাড়াও শিশুকে দানশীল করার জন্য তার হাত দিয়ে ফকিরকে পয়সা বা ভিক্ষা দিতে হবে এবং নিজের খাবার থেকে অন্যকে দেয়ার অভ্যাস করতে হবে।

শিশু যতই বড় হতে থাকে, সাথে সাথে তার শিক্ষা বিচরণ ক্ষেত্রও প্রসারিত হতে থাকে। ধাপে ধাপে সে সীমা দূর হতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে। এক সময় সে যৌবনে পদার্পণ করে। এভাবে সে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যখন তাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা লাভ বা কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যে চলে যেতে হয়। সেখানে তাকে মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর অবস্থান করতে হয়। অন্যদেশে ভিন্ন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে চলার জন্য তখন পরিবারের শিক্ষাই সেক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যা সে শিশুকাল থেকে আয়ত্ব করেছে। শুধু তাই নয়, এ শিক্ষা তার চলার পথে পাথেয় ও দিক নির্দেশনা হিসাবেও কাজ করে। একজন আদর্শ মুসলমান হিসাবে সে তার শিষ্ঠাচার, সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সহনশীলতা, নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য, সংযম, সহিষ্ণুতা, কর্তব্য নিষ্ঠা, আনুগত্য, আজ্ঞানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণাবলী দ্বারা নিজেকে অন্যের নিকট উপস্থাপন করতে পারে। এ ভাবে তার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ও সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটে। অন্যরা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারে এবং এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। অপরদিকে নিজেদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষায় দক্ষতা ও কর্মে সুফল লাভ করতে পারে এবং সদাচার ও সুন্দর আখলাকের জন্য সবার শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। কাজেই পারিবারিক শিক্ষা যদি সঠিক ভাবে লাভ করা না যায় তবে পরবর্তী কালের কোন শিক্ষাই সুফল বয়ে আনতে পারে না; যশ ও সম্মান লাভ তো দূরের কথা। মানবজাতির প্রতি খোদা তাআলার শ্রেষ্ঠদান হলো জ্ঞান বা আলো। তাই এ জ্ঞান লাভের উপযোগী করে শিশুকে গড়ে তোলা একটি পবিত্র দায়িত্ব।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন–'তুমি কখনো অর্থের দ্বারা মানুষকে বিত্তশালী করতে পারবে না। সুতরাং তুমি তাদেরকে বিত্তশালী কর প্রফুল্লা বদনে ও উত্তম চরিত্র দ্বারা।' তিনি আরো বলেছেন–'আমি আবির্ভূত হয়েছি যেন আমি আখলাককে পরিপূর্ণতা দান করি।' তাই মুসলমানদের আখলাক হবে রসূল পাক (সা.) এঁর আখলাকের অনুরূপ। এরূপ আখলাক গঠনের শিক্ষাই হলো 'ইসলামী শিক্ষা।' হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন হয়েছে কুরআন পাকের শিক্ষা এবং নবী করীম (সা.) এর আদর্শ সহ ইসলামের সৌন্দর্যকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। আর কাল বিলম্ব না করে এখন মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য হলো তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদেরকে সংশোধন করা। নিজ সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে আখলাককে পরিপূর্ণতা দান করা। তবেই সম্ভব হবে ইসলামের হারানো সৌন্দর্য, গৌরব এবং জ্ঞান-গরীমা পুনরায় ফিরে পাবার।

কীর্তিমান জীবন কথা–

ধর্মপরায়ণ এক নারী সৈয়দা আজিজাতুননেসা

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

চট্টগ্রাম মুরাদপুরস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের কবরস্থান। এখানে সৈয়দা আজিজাতুননেসা সাহেবার কবর। মরহুমার কবরের পাশে দাঁড়ানো মোহতারাম মাহমুদ হাসান সিরাজী, আমীর চট্টগ্রাম (মাঝখানে) মাওলানা আব্দুল মতিন, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (ডানে) ও লেখক (বামে)।

মহিলাদের মধ্যে প্রথম মুসলমান কে? এর উত্তর আমরা অনেকে জানি–উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)। হযরত রসূল করীম (সা.) মক্কাবাসীদের সামাজিক অনাচার প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং নির্জনে আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য লাভে ইবাদত করতেন। অবশেষে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি প্রথম কুরআনী ওহী প্রাপ্ত হন। ফলে তাঁর হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। ঘাবড়ে যান। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ভাবেন–খোদা তাআলার দেওয়া এত বড় জিম্মাদারী বা দায়িত্ব কী পালন করতে পারবেন। বাড়ী ফিরে আসেন। তখন তাঁর সুখ দুঃখের জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদীজা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, কি হয়েছে? তিনি পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন, আমার মত দুর্বল মানুষ এত বড় বোঝা কেমন করে বইবে? তখন হযরত খাদীজা (রা.) শান্তনায় বলেন,–খোদার কসম! এই বাণী খোদা তাআলা আপনার উপরে এ জন্য নাযিল করেননি যে, তিনি আপনাকে অযোগ্য ও অকৃতকার্য করবেন এবং আপনার সঙ্গ ছেড়ে দিবেন। খোদা কি কখনও এমন করতে পারেন? আপনি তো সেই ব্যক্তি যিনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করেন, গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করেন। তাদের বোঝা নিজে বহন করেন। যে চরিত্র গুণ এ দেশ থেকে উঠে গেছে তা সবই আপনার মাধ্যমে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আপনি অতিথির সেবাকারী, দুঃখী মানুষের সহায়তাকারী। এই রকম মানুষকে কি খোদা তাআলা কখনও পরীক্ষার মধ্যে ফেলে রাখতে পারেন? স্বামীর প্রতি তাঁর এ অগাধ বিশ্বাস ও আস্থার ফলশ্রুতিতে তিনি তখনই ঈমান আনেন। সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে প্রথম মুসলমান হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ফলে হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) নামটি ইসলামের ইতিহাসে অম্লান হয়ে রয়েছে।

বিশ্ব নবীর বিশ্ববাণীকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠার জন্য আখেরী যামানায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি ইমামুজ্জামান উম্মতী নবী । আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে নির্দেশিত হয়ে তিনি ২৩ মার্চ ১৮৮৯ খ্রীঃ থেকে বয়আত গ্রহণ শুরু করেন। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় হযরত আহমদ জান সাহেব (রা.) বাড়ীতে প্রথম সেই ঐতিহাসিক বয়আত অনুষ্ঠান হয়। অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বেগম সাহেবা উম্মুল মু'মিনীন হযরত নুসরত জাঁহান বেগম (রা.) আবেগাপ্লুত হয়ে মহিলাদের মধ্যে প্রথম বয়আত করে তারিখে আহমদীয়াতে আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্বরিত হয়েছেন। হযরত রসূল করীম (সা.) এ প্রথম মহিলা আনুগত্যকারী যেমন তাঁর জীবনসঙ্গিনী তেমনি ধর্মজগতে সূর্যের অনুবর্তিতে উদিত চন্দ্রের আলোতে আলোকিত প্রথম মহিলা তাঁর বেগম সাহেবা। উভয়ই উম্মুল মু'মিনীন।

এখন যদি প্রশ্ন হয়, বাঙালিদের মধ্যে

প্রথম কোন মহিলা আহমদী হন। এর উত্তর হয়তো আমাদের অনেকেরই অজানা। তিনি হলেন সৈয়দা আজিজাতুননেসা সাহেবা। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর থানার অন্তর্গত তাতারকান্দী গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকের প্রথম দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক। মাতা খুরশীদুননেসা। তাঁর মাতার পূর্ব পুরুষ আবু জাফর নিজেকে খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর বংশধর বলে দাবী করতেন। তিনি ১৫৭৫ সালে মক্কা থেকে হিজরত করে ভারতে আসেন এবং সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর অধঃস্তন পুরুষ আফসার জঙ্গ গাজী উদ্দীন হায়দার, সুবেদার শাহ শুজার সামরিক সহযোগী হয়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাকে নবাব শায়েস্তা খাঁ ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিম বায়েদ নামক অঞ্চলটি নিস্কর স্বত্বে দান করেন। ফলে তার উত্তরাধিকারী মোহাম্মদ আনসার অনেক সম্পত্তির মালিক হন। অপরদিকে আনসার সাহেবের মাতা আলমজান বিবি ছিলেন আওলিয়া পরিবারের সন্তান। আওলিয়া শাহ্ হারুন অর রশিদ ছিলেন তার পূর্ব পুরুষ। তিনি বাগদাদ থেকে ঢাকার সোনারগাঁও এসে বসতি স্থাপন করেন। ঢাকার নবাবের দেওয়ান ছিলেন রাজা রাজবল্লভ। তার পুত্র রাজা রামদাসের শিক্ষক ছিলেন মুহাম্মদ মুরাদ। তিনি আওলিয়া পরিবারের উত্তরাধিকারী। রাজা রাজবল্লভের প্রচেষ্টায় মুরাদ সাহেব ঢাকার নবাবের নিকট থেকে ময়মনসিংহ জেলার তাতারকান্দী এলাকায় জায়গীর স্বরূপ কয়েকখানা গ্রামের মালিকানা প্রাপ্ত হন। ফলে আনসার সাহেব মাতৃ ও পিতৃ উভয়কুলের উত্তরাধিকারী হিসেবে তালুকদারী লাভ করেন।

তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

(ক)

১। আবু জাফর মক্কী,

২। তদ্বীয় পুত্র আবু আবেদ,

৩। তদ্বীয় পুত্র আবুল হাশেম,

৪। তদ্বীয় পুত্র আফসার জঙ্গ গাজী উদ্দীন হায়দার,

৫। তদ্বীয় পুত্র মোহাম্মদ রফি,

৬। তদ্বীয় পুত্র আব্দুল কাদের,

৭। তদ্বীয় পুত্র আবুল হাসেম মোহাম্মদ জাকি,

(আলমজান বিবির স্বামী) এবং,

৮। তদ্বীয় পুত্র মোহাম্মদ আনসার।

(খ)

১। আওলিয়া শাহ্ হারুন অর রশিদ বাগদাদী,

২। তদ্বীয় পুত্র নাসির উদ্দিন,

৩। তদ্বীয় পুত্র অলি মোহাম্মদ,

৪। তদ্বীয় পুত্র বদর উদ্দিন,

৫। তদ্বীয় পুত্র মোহাম্মদ মুরাদ,

৬। তদ্বীয় ভাই মোহাম্মদ আশরাফ,

৭। তদ্বীয় মেয়ে আলমজান বিবি এবং

(আবুল হাশেম মোহাম্মদ জাকির পত্নী)

৮। তদ্বীয় পুত্র মোহাম্মদ আনসার।

আনসার সাহেবের ছিল নয় সন্তান। তারা হলেন ঃ (১) মোহাম্মদ আতাহার (২) মোহাম্মদ আখতার (৩) মোহাম্মদ মোতাহার (৪) মোহাম্মদ মাজহার (৫) মোহাম্মদ আজহার (৬) বদরুননেসা (৭) কামরুননেসা (৮) খুরশীদুননেসা এবং (৯) আশরাফুননেসা। মোহাম্মদ আজহার সাহেব কলকাতা থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভে বৃটিশ সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী করেন। তিনি ডিপুটি কমিশনার ও ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৮৭৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত তিনি সুদীর্ঘ ৩৫ বছর দক্ষতা ও সুনামের সাথে চাকুরী করেছেন। অবিভক্ত বাংলায় সমাজসেবামূলক কাজে তার ভূমিকা অগ্রণী ছিল। তিনি এ দেশে মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতায় ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে অনেক কাজ করেছেন। বৃটিশ সরকার তার কর্মজীবনের সার্থকতা মূল্যায়নে ১৯১৬ সালে খান বাহাদুর উপাধীতে ভূষিত করেন (তথ্য সূত্র ঃ মুক্তিদূতঃ খান বাহাদুর মৌলভী মোহাম্মদ আজহার। সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ ইলাহী বখশ)।

খুরশীদুননেসা ও তাঁর স্বামী সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব ধর্মপরায়ণ ও প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন। তাদের ছিল চার ছেলে দুই মেয়ে। যথা (১) সৈয়দ সামসুল হক (২) সৈয়দ মাহফুজুল হক (৩) সৈয়দ নূরুল হক (৪) সৈয়দ আজিজুল হক (৫) সৈয়দা আফজালাতুননেসা (৬) এবং সৈয়দা আজিজাতুননেসা। তারা বাল্যকালে বাড়ীতে ধর্মীয় তালিম তরবিয়ত লাভে উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন। মামা আজহার সাহেবের অনুপ্রেরণায় বড় দুই ছেলে কোলকাতায় লেখা পড়া করেন। সামসুল হক সাহেব বিএ বিএল ডিগ্রী

লাভে স্বনামধন্য এ্যাডভোকেট হন। কিন্তু দুরভাগ্যবশতঃ বসন্ত রোগের মহামারীতে যৌবন বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। দ্বিতীয় ছেলে মাহফুযূল হক স্কুলের চৌকাঠ পাড় হওয়ার পূর্বেই বসন্তরোগে মৃত্যুবরণ করেন। তখন বসন্ত ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবে মানুষের মৃত্যুতে গ্রাম কি গ্রাম উজার হয়ে যেতো। তৃতীয় ও চতুর্থ ছেলে এবং দু'মেয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করেন।

সেকালে মুসলমান সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তিশালী পরিবারের ছেলেদের লেখাপড়ার কিছুটা সুযোগ থাকলেও নারী শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। নামায, রোযা ও কুরআন শিক্ষা লাভে কিশোরী বয়সে স্বামীর ঘরসংসার করাই ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি। কেননা তখনও মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার মুসলমান নারী শিক্ষার জাগরণ হয়নি। মেয়ে মহলে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। সামাজিক এ প্রেক্ষাপটে রাজ্জাক সাহেব তার দু মেয়েকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করেন। ছোট মেয়ে আজিজাতুননেসা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার সাথে ভাইদের অনুপ্রেরণায় বাড়ীতে বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। নারী শিক্ষার অগ্রপথিক বেগম রোকেয়া বাল্যকালে বাড়ীতে সহোদর ভাইদের নিকট যেমন আধুনিক শিক্ষার হাতেখড়ি লাভ করেছিলেন, সে দৃশ্যপট তাঁর জীবনেও পরিস্ফুটিত ছিল। ফলে তখন থেকেই তাঁর মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর বিনয় ব্যবহার ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সকলের নন্দিত হয়। অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট তিনি অত্যন্ত স্নেহভাজন হন। সে সুবাদেই পার্শ্ববর্তী কটিয়াদী থানার নাগেরগাঁও গ্রামের প্রসিদ্ধ খাঁ বাড়ীর শিক্ষিত যুবক রইছ উদ্দীন খাঁ সাহেবের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স এগার কি বার বছর এবং রইছ উদ্দীন সাহেবের বয়স প্রায় সাতাইশ থেকে ত্রিশের মাঝে। তাঁর এই বাল্য বিবাহ নিয়ে তিনি নাতি নাতনীদের সাথে প্রায়ই গল্প করতেন। বলতেন, 'একদিন হঠাৎ দেখি আমাদের বাড়ীর দিকে বর আসছে। কৌতুহলী হয়ে আমি অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে বর ও বরযাত্রী দেখতে যাই। দেখি তারা আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। পরে শুনি আমার বিয়ে। অবুঝ মনে অনেক কান্না করি। অভিভাবকদের সান্ত্বনায় বিয়ে হয়। শ্বশুর বাড়ী চলে যাই। সেই দিনের কথা কখনও ভুলিনি।'

ফলে দুটি পবিত্র আত্মার মধ্যে সেতু বন্ধন গড়ে উঠে। সহধর্মীদের মাঝে সহমর্মীতার এক উজ্জ্বল আদর্শ প্রজ্জ্বলিত হয়। সুখে দুঃখে একে অপরের হরিহর আত্মায় পরিণত হয়ে যান। তাই রইস উদ্দীন সাহেব সরকারী ডাক বিভাগের বিভিন্ন স্থানে চাকুরী কালে তার প্রেয়সী স্ত্রী সাথে ছিলেন। জ্ঞান অর্জনে তাঁর অনুরাগ, মেধা ও সুপ্ত প্রতিভা প্রত্যক্ষ করে তাকে বাংলা, উর্দু ও ফারসি ভাষা শিক্ষা দেন। ফলে বিদ্যানুরাগী ধর্মপরায়ণ মহিলা সুযোগ্য স্বামীর নিকট থেকে শিক্ষা লাভে ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষায় জ্ঞানবান হন। উল্লেখ্য, মুসলিম নারী শিক্ষার পথিকৃত বেগম রোকেয়া বিয়ের পর তার স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের অনুপ্রেরণায় শিক্ষা লাভে বিশিষ্ট্য শিক্ষাবিদ, সুসাহিত্যিক ও জ্ঞান তাপসে পরিণত হন এবং মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

আল্লাহ্ তাআলার মহা পুরস্কার লাভের সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রইছ উদ্দীন সাহেব ১৯০৬ সালে কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আসার পর অনেক আত্মীয় স্বজন এবং গ্রামবাসী বৈরীতা করলেও তাঁর উত্তম জীবন সঙ্গিনী কখনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন নি। স্বামীর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল, তিনি জ্ঞানী গুণী ও অলী আল্লাহ্ মানুষ। জেনে শুনে কখনও অকল্যাণকর কাজ করেন নি। বিপথে চলেননি। ফলে পুণ্যবান স্বামীর আদর্শগত শিক্ষায় তাঁর পবিত্র মনে আহমদীয়াতের সত্যতার অনুরাগ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তাআলার হেদায়াত লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে তার যৌবনকালের পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন। ফলে তার পবিত্র মনে এর সত্যতা পূর্ণাঙ্গভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। তাই স্বামীর বয়আত গ্রহণের এক বছর পর ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)এর ওফাতের আট মাস পূর্বে হুযূর (আ.) এর খেদমতে পত্রের মাধ্যমে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি মহিলাদের মধ্যে প্রথম বাঙালি আহমদী হবার গৌরব লাভ করেন। আহমদীয়াতের ইতিহাসের স্বার্ণালী অধ্যায়ে আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্বরিত হয়ে উঠেন।

সাহাবীর সহধর্মিনী বয়আত গ্রহণের পর স্বামীর সাথে জামাআতের খেদমতে

নিবেদিত ছিলেন। আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের কাজে সর্বাত্মক সহযোগীতা করেন। খাঁ সাহেব বার্মায় ডাক বিভাগে কর্মরত অবস্থায় তবলীগের কাজে তাঁর পূর্ণাঙ্গ সহযোগী ছিলেন। ১৯১২ সালে নিজ বাড়ী নাগেরগাঁও চলে আসার পর তাঁর একমাত্র সতীর্থ ছিলেন তিনি। তখন খাঁ সাহেব নিজ বাড়ীতে অনেক তবলীগি সভা করেন। আর এসব সভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ণসহ ব্যবস্থাপনায় তাঁর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এক দল মোখালেফাতকারী থানায় মিথ্যা অভিযোগ করেন–'খাঁ সাহেব সরকারী পেনশনভুক্ত কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও বাড়ীতে সভার আয়োজন করে রাজদ্রোহীমূলক বক্তব্য রাখেন। এতে জনসাধারণের মাঝে রাজভক্তি নষ্ট হচ্ছে। তাকে দমন করা প্রয়োজন'। তখন থানার দারোগা গ্রামে তদন্ত করতে এলে খাঁ সাহেব বীরত্বের সাথে সত্যতা উপস্থাপন করেন। ফলে দারোগা সত্যতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। আর এ উদ্ভুত পরিস্থিতিতে স্বামীর পাশে ছিলেন এ মহীয়সী নারী। তিনি বিগলিত চিত্তে দোয়া করেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন এবং শক্তি যোগিয়েছেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভূমিকা রাখেন। ফলে খাঁ সাহেব রাজদ্রোহীতার অভিযোগ থেকে মুক্তি পান। এমন গুণগ্রাহী মহিলাদের উদ্দেশ্যেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম গেয়েছেন ঃ

কোন কালে একা হয়নিকো জয় পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয় লক্ষ্মী নারী।

এ বীর বাঙালি নারী নাগেরগাঁয় আত্মীয়দের মাঝে নারী মহলে অনেক তবলীগ করেছেন। তাঁর বিনয় ব্যবহার, সহমর্মিতা ও মানবসেবা মানুষকে আকৃষ্ট করে। তাঁর আতিথেয়তায় মানুষ মুগ্ধ হতেন। তিনি আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেক ছেলেমেয়েকে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়া শিক্ষা দিয়েছেন। খাঁ সাহেবের জীবদ্দশায় যে ২০/২৫ জন আহমদী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাদের মধ্যে মহিলাদেরকে জামাআতীভাবে তালিম তরবীয়ত দেন। পৈতৃক বাড়ী তাতারকান্দী গিয়ে আত্মীয়দের নিকট হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ অকপটে প্রচার করেছেন। ফলে বড় বোন সৈয়দা আফজালাতুননেসা ও ছোট ভাই সৈয়দ আজিজুল হক বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তখন তাঁর মামা মোহাম্মদ মাজহার সাহেবের ছেলে আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী আনওয়ার বিদ্যা অর্জনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এ স্কুলটি তৎকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কিশোরগঞ্জ এলাকার প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ ছিল। স্কুলের প্রধান মৌলভী শিক্ষক ছিলেন, মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রাহে.), বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম আমীর। ধার্মিক ছাত্র আনোয়ার সাহেব তার শিক্ষা গুরু মাওলানা সাহেবের নিকট স্কুলের পাঠ্যজ্ঞান ছাড়াও যুগ ইমাম হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের সত্যতার জ্ঞান আহরণ করেন। উপরন্তু তাঁর ফুফাতো বোন সৈয়দা আজিজাতুননেসা সাহেবা তাঁকে বয়আত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে তিনি ১৯১৯ কিংবা ১৯২০ সালে দশম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তিনি জামআতে আহমদীয়ার বিশিষ্ট বুযুর্গ ছিলেন। তাতারকান্দী জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট এবং প্রায় তিন দশক পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। বাংলা ভাষায় জামাআতে আহমদীয়ার প্রকাশনায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। জামাআতের অনেক বই তিনি বঙ্গানুবাদ করেছেন। মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ মুরুব্বী সিলসিলাহ তাঁর সুযোগ্য সন্তান। তিনি ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আজিজাতুননেসা সাহেবার প্রচেষ্টায় বড় বোন আহমদী হলেও তাঁর ভগ্নীপতি সৈয়দ আব্দুল বারী সাহেবের কপালে আহমদীয়াতের রাজটীকা লাগেনি। এ ধর্মপ্রাণ মহিলা পারিবারিক প্রতিকুল স্রোতে আহমদীয়াতকে আগলে ধরে সন্তানদেরকে নিয়ে এগিয়ে গেছেন। ফলে তার চার ছেলে (১) সৈয়দ সাঈদ আহমদ (২) সৈয়দ আতাউর রহমান (৩) সৈয়দ সামসুল আলম এবং (৪) সৈয়দ নূরুল আলমের মধ্যে তৃতীয়জন ব্যতিত বাকীদের মাঝে আহমদীয়াত পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। দু'টি মেয়ে (১) সৈয়দা হুমায়রা আক্তার এবং (২) সৈয়দা রৌশন আক্তারের ধর্মপরায়ণ খালার উদ্যোগে জামাআতের পরিমন্ডলে বিবাহ হয়। বড় মেয়ের বিয়ে হয় তার ভ্রাতুষ্পুত্র রইছ উদ্দীন খাঁ সাহেবের বড় ভাইয়ের ছেলে কমর উদ্দিন খাঁ দারোগার সাথে। দ্বিতীয় মেয়ের স্বামী আহমদীয়া জামাআতের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দেবগ্রামের এ্যাডভোকেট মুন্সী দৌলত আহমদ খাঁর ছেলে এরাদতউল্লাহ্ খাঁ। বলাবাহুল্য এ্যাডভোকেট মুন্সী দৌলত আহমদ খাঁ সাহেব ১৯০২ সালে লাহোর হতে আনিত মোফাররাহে আম্বারী নামক হেকিমী ঔষধের পার্শ্বেলের সাথে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত হন। যার ফলশ্রুতিতে মাওলানা মোহাম্মদ সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব দীর্ঘ প্রায় এক দশক গবেষণার পর আহমদীয়াত গ্রহণ এবং বঙ্গদেশে প্রথম জামাআত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আফজালাতুননেসা সাহেবার আহমদী সন্তানরা জামাআতের খেদমত করেছেন। ছেলে নূরুল আলম সাহেবের সন্তান মহিউদ্দীন আহমদ জুবায়ের ও সালাহ উদ্দিন আহমদ তারেক বর্তমানে লন্ডন প্রবাসী এবং জামাআতের সক্রিয় কর্মী।

জামাআতে আহমদীয়ার নন্দীতা মহিলা আজিজাতুননেসা সাহেবা ইসলামের খেদমত ও স্বামীর প্রতি যথার্থ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাঝে ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খাঁ সাহেব ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি উত্তম জীবন সঙ্গী হারান। তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। তিনি নিঃসন্তান। ফলে এ ধর্মপরায়ণ মহিলা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী জামাআতে আহমদীয়ার আর এক বুযুর্গ প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেবের সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এক বঙ্গ রত্নের অন্তর্ধানের পর অপর বঙ্গরত্ন লাভ করেন। তিনি লতিফ সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। বঙ্গীয় প্রথম আমীর মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের ১৯২৬ সালে মৃত্যুর পর আব্দুল লতিফ সাহেব দ্বিতীয় আমীর নিযুক্ত হন। ফলে ধার্মিক স্ত্রী আমীর সাহেবের সংস্পর্শে জামাআতের খেদমতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ১৯২২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কর্তৃক লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রতিষ্ঠার আলোকে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জামাআতের মহিলাদেরকে তিনি সাংগঠনিক কাঠামোতে তালিম তরবীয়ত প্রদান করেন। বড় বড় জামাআতে লাজনা ইমাইল্লাহ্ সংগঠন প্রতিষ্ঠার হাতেখড়ি দেন। ফলে জামাআতের নারী মহলে প্রাণচঞ্চলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তকদীরের লিখন ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ তারিখ আব্দুল লতিফ সাহেব পরলোকগমন করেন। তবে খোদার উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল মানুষ জীবনসঙ্গীকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ হলেও কখনও নিরাশ ও বিষন্ন হন নি। পুর্ণোদ্যমে জামাআতের কাজে আত্মনিবেদিত ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসা ছাড়াও বিভিন্ন জামাআতের জলসা ও তালিম তরবীয়তি অনুষ্ঠানে লাজনাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। ২৭-২৯ অক্টোবর ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত ২৩তম সালানা জলসার তৃতীয় দিনের প্রথম মহিলাদের অধিবেশন হয়। এতে সকলের শ্রদ্ধাভাজন বর্ষিয়ান মুরুব্বী সভাপতির আসন অলংকৃত করেন এবং জামাআতের মহিলাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় নিজ পরিবার ও সমাজে আদর্শ নারী হওয়ার গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন। তার সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রাণবন্ত হয় (পাক্ষিক আহমদী ৩১ অক্টোবর ১৯৩৯)।

১৯৩৯ সালে ২৬-২৯ ডিসেম্বর কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক খিলাফত জুবিলী জলসা। জামাআতে আহমদীয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) খিলাফতের পঁচিশ বছরের পূর্ণতা এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জন্ম ও তাঁর কীর্তিমান স্বর্ণালী জীবনালেখ্যের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার পঞ্চাশ বছর অতিক্রমের সাল। ফলে ব্যাপক বর্ণাঢ্যে ঐশী প্রেমিকদের মিলন মেলার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের আহমদীরা চাঁদা প্রদান এবং জলসায় যোগদান করেন। বঙ্গদেশ থেকে অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি চাঁদা দেন এবং **আশি জনের একটি কাফেলা যোগ দেন।** সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন আজিজাতুননেসা সাহেবা। তিনি এবং তাঁর সতীন অর্থাৎ প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেবের প্রথম স্ত্রী সামসুন্নাহার খাতুন আঠারো টাকা করে চাঁদা দান করেন এবং উভয়ে মিলে বঙ্গীয় কাফেলার সাথে কাদিয়ান যান (পাক্ষিক আহমদী ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৯)। ফলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্মৃতি বিজরিত পুণ্যভূমি কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এবং বিশিষ্ট বুযুর্গ সাহাবী ও আলেমদের সান্নিধ্যে তাদের বক্তৃতায় ও নূরের পরশে আলোকিত মানুষ হন।

সবার বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বী নিঃসন্তান হলেও এদেশের ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁর ছিল সন্তানতুল্য স্নেহমমতা ও আন্তরিক ভালোবাসা। সকলের মঙ্গল কামনায় খাস দোয়া করেন। দোয়ার অপূর্ব ভান্ডার ছিল তাঁর মাঝে। ফলে এ পুণ্যবতী বঙ্গজননী কোথাও গেলে মানুষ গভীর ভক্তি শ্রদ্ধাভরে তাঁর নিকট দোয়ার আরজ করতেন। তাঁর পৈতৃক ও স্বামীর বংশোদ্ভুত অসংখ্য নাতী-নাতনীর শ্রদ্ধার মুকুট ছিলেন তিনি। বহু জন তাঁর নিকট থেকে কুরআন শিক্ষাসহ ধর্মীয় তালিম তরবীয়ত লাভে আলোর পথের দিশা পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব বলেন–'জ্ঞাতীতে তিনি আমার নানী

ছিলেন। আমাদের বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল বেড়াতে আসতেন। তখন ছেলে মেয়েরা কে কি করে খোঁজ নিতেন। এবং ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষায় উত্তম মানুষ হওয়ার উপদেশ দিতেন। কেউ দুষ্টামী করলে কিংবা কর্তব্যে অবহেলা করলে তাকে শাসন করতেন। তিনি যেমন মায়াভরা আদর সোহাগ করেছেন তেমনি মানুষ করার জন্য কড়া শাসন করেন। আমরা তাঁর অনেক স্নেহশীষ লাভের সৌভাগ্যবান হয়।

চট্টগ্রাম জামাআতের লাইয়েকা বেগম সাহেবা স্মৃতিচারণে বলেন–পবিত্র কুরআন শরীফের প্রতি আমার দাদী সাহেবার গভীর ভালবাসা ছিল। তিনি প্রত্যহ সুললীত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মাহে রমযান আসলে তিনি বেশ ক'বার কুরআন খতম দিতেন। সর্বদা সকলকে নামায ও কুরআন পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর যেন আজও কানে বাঁজে। তাঁর পড়া সেই কুরআন শরীফ আমি সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখি। বর্তমানে তা জামাআতকে প্রদান করেছি।

ঢাকার সৈয়দা শওকত জাহান সাহেবা বলেন–আমার মায়ের ফুফু ছিলেন এ মহীয়সী মহিলা। তিনি খুব পরহেজগার ও আল্লাহ্ ওয়ালা মানুষ ছিলেন। ইবাদতই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন সাধনা। তাহাজ্জুদ নামাযে বিগলিত চিত্তে দোয়া করা তার জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উর্দু ও ফারসী নযম পাঠ করে আমাদেরকে শুনাতেন। জামাআতের ঈমান বর্ধক এবং অতীত দিনের স্মৃতি বিজরিত ঘটনা বর্ণনা করতেন। আমরা তাঁকে হারিয়ে দোয়ার এক ভান্ডার হারিয়েছি।

তাতারকান্দীর সৈয়দা মোমেনা বেগম সাহেবা বলেন, তিনি আমার শ্বাশুরীর ছোট বোন হলেও আমি তাঁর নিকট থেকে মাতৃতুল্য স্নেহ মমতা ও ভালবাসা পেয়েছি। আমার স্বামী সৈয়দ নূরুল আলম সাহেবকে তিনি নিজ সন্তানের মত দেখতেন। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার, ন্যায় নীতিবান ও স্পষ্টভাষী মানুষ ছিলেন। কোন অন্যায়কে সহ্য করতেন না। সর্বদা আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁকে দেখলে আপনা আপনি ভক্তি শ্রদ্ধা আসতো।

১৯৬৬ সালে তিনি একবার ঢাকায় আসলে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার একদল খাদেম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দোয়ার মিনতি জানান। সেদিন তিনি সোনার ছেলেদেরকে স্নেহভরা কণ্ঠে নসিহত করেন। প্রকাশিত সেই প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ ঃ

গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলার প্রথম মহিলা আহমদী সৈয়দা আজিজাতুননেসা সাহেবা তার বাসস্থান নাগেরগাঁও হতে ঢাকায় আগমন করেন। তিনি বাংলার দ্বিতীয় আহমদী সাহাবী হযরত রইছ উদ্দীন খাঁ সাহেবের পত্নী। তাঁর বয়স নূন্যতম ৮০ বছর। আল্লাহ্‌র ফযলে তিনি শারিরীকভাবে কুশলে আছেন। চশমা ছাড়াই পত্রিকাদি পড়তে পারেন। তাঁর সাথে সাক্ষাতকারী যুবকদেরকে তিনি তবলীগের দিকে বেশি জোর দেওয়ার জন্য উপদেশ দেন, দোয়া করেন এবং যুবকদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নসিহত করেন (পাক্ষিক আহমদী ১৫ জুন ১৯৬৬)। তাঁর এ দোয়া ও উপদেশের ফলশ্রুতিতে অনেকে ইসলামের খেদমতে অনুপ্রাণিত হয়।

প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেবের প্রথম স্ত্রী সামসুন্নাহার খাতুনের সাথে তাঁর সহোদর বোনের মত হৃদ্যতা ছিল। উভয়ে সম্পর্কে সতীন হলেও গভীর আন্তরিকতার সুসম্পর্ক পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন এক সাথে বসবাস করেছেন। তিনি সতীনের ছেলে-মেয়েদেরকে নিজের গর্ভজাত সন্তানের মত মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেন। নাগেরগাঁও প্রথম স্বামীর উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি এবং তাতারকান্দীর পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অনেকাংশ এ সন্তানদের তরে নির্বাহ করেছেন। ফলে স্নেহশীষ সন্তান গোলাম আহমদ খান ফালু মিয়া, মাহমুদা বেগম ও মোহসেনা বেগম তাঁকে নিজ মায়ের মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। সৎ মা শব্দের স্বার্থকতা প্রজ্জ্বলিত হয়। এমন কি তাদের সন্তানরাও এ নানীর নিকট যে ভালবাসা ও আদর সোহাগ পেয়েছেন তা তারা আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

জীবনের পরন্তু বেলায় বার্ধ্যকের দিনগুলিতে তিনি তাঁর ছোট ভাইয়ের ছেলে সৈয়দ আমিনুল হক সাহেবের চট্টগ্রাম ষোলশহরস্থ বাসভবনে বসবাস করেন। সেখানে সবার সেবা যত্নের মাঝে ইহজীবনের সার্থকতায় ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ সালে আপন মৌলার ডাকে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন। বাংলার আকাশে উদিত এ উজ্জ্বল নক্ষত্র অস্তমিত হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৯৫ বছর। চট্টগ্রাম মুরাদপুর জামাআতে আহমদীয়ার নিজস্ব কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি চলে গেলেও অমর হয়ে আছে তাঁর ধর্মীয় তালিম তরবীয়তমূলক শিক্ষা। কিংবদন্তী হয়ে আছে তাঁর কর্ম ও জীবনালেখ্যের আদর্শ। আহমদীয়াতের ইতিহাসের স্বর্ণালী পাতায় অনির্বাণ থাকবে এ ক্ষণজন্মা মহিলার নাম ও কীর্তিত্ব। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বেহেশ্‌তের উচ্চ মকাম নসীব করুন।

বাংলাদেশ জামাআতের প্রবীণ ও একনিষ্ঠ সেবিকা মুকাররম মাসুদা সামাদ সাহেবা আর নেই

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, মোহতরমা মাসুদা সামাদ সাহেবা যিনি মোহতরম ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব এর স্ত্রী ছিলেন, তিনি গত ৭ ডিসেম্বর ২০০৮ সকাল ৮টা ৩ মি. ধানমন্ডি ৩২ নং এ নিজ বাসভবনে প্রিয় খোদার সান্নিধ্য লাভ করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুমা মোহতরমা মাসুদা সামাদ সাহেবা মরহুম খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব এর কন্যা ছিলেন। তিনি কাদিয়ানে হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) এবং উম্মুল মু'মি-নীনদের তরবীয়তের মাঝে বড় হয়েছেন। কাদিয়ানে তাঁর সহপাঠিনীদের মাঝে হযরত মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব এর স্ত্রীও অন্তভুক্ত ছিলেন। মরহুমার শিক্ষকগণের মাঝে হাফেয মাওলানা রৌশন আলী সাহেবও অন্তর্ভুক্ত। হাফেয রৌশন আলী সাহেব এর কাছ থেকে মরহুমা পবিত্র কুরআনের ২২ পারা হিফয করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এছাড়া পারিবারিক আত্মীয়তার সূত্রে হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) এর সান্নিধ্যে থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের বিশেষ সুযোগ তাঁর হয়েছিল। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৪ পুত্র ১ কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমা অত্যন্ত নেক এবং ধার্মিক মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনে নেহায়াত খোদাভক্তি, নামাযে পাবন্দ এবং খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখতেন। তিনি সাধারণ জীবন যাপন এবং দুস্থদের সেবায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি সব সময় দোয়া করতেন, **'হে খোদা আমার জামাআতকে উন্নতি দাও এবং সর্বদা তোমার সাহায্য ও সহযোগিতা তারা যেন সব সময় পেতে থাকে।'** তিনি সন্তানদেরকে নসিহত করতেন **'আমি ফেরত যাওয়ার সময় যেন দেখি সকলে তাক্‌ওয়ায় পরিপূর্ণ'।**

মরহুমার স্বামী ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ এর প্রাক্তন নায়েব ন্যাশনাল আমীর ছিলেন। মরহুমা আহমদীয়া মুসলিম জামাআত এর অংগসংগঠন লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ এর সদর হিসেবে দীর্ঘদিন খুবই নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। মরহুমার এক ছেলে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, যিনি বর্তমান বাংলাদেশ জামাআতের মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর এর দায়িত্বে জামাআতের খেদমত করছেন। মরহুমার অন্যান্য সন্তানরাও জামাআতের খেদমত করে যাচ্ছেন।

মরহুমার জানাযা নামায ৭ ডিসেম্বর ২০০৮ বিকাল ৪টা ২০ মি. ঢাকা মহানগরের বকশীবাজারে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় মসজিদ অনুষ্ঠিত হয়। এ জানাযা পড়ান আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের বর্তমান ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান সাহেব। মরহুমার জানাযায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আহমদী-অআহমদী অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। জানাযায় পর্দার আড়ালে এক বিরাট সংখ্যায় মহিলারাও অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে দোয়া করে মরহুমার মরদেহ তাদের পারিবারিক কবরস্থান নাটোরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মরহুমার দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় আর এ জানাযা পড়ান মরহুমার পুত্র মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর। জানাযা শেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব নিজে উপস্থিত থেকে দাফন কাজ সমাপ্ত করে দোয়া করান ও ঢাকায় ফিরে আসেন।

মরহুমার মৃত্যুর সংবাদ শুনে বিভিন্ন দেশের আমীর সাহেবগণ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এছাড়াও মরহুমার মৃত্যুতে এদেশের প্রতিটি আহমদী ঘরে এক শোকের ছায়া বিরাজ করে। মরহুমার মৃত্যুতে বাংলাদেশ জামাআতে নিঃসন্দেহে বড় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। মরহুমা জামাআতের খিদমতের কারণে দীর্ঘকাল সবার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আল্লাহ্ তাআলা মরহুমার রূহের মাগফিরাত করুন এবং তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। মরহুমার আহমদীয়াত ও খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা এবং একনিষ্ঠ সেবা খোদা তাআলার সন্নিধানে গৃহীত হোক।

মরহুমার অনুপস্থিতিতে খোদা তাআলাই তাঁর পরিবারের সর্বোত্তম অভিভাবক হোন। আল্লাহ্ তাআলা মরহুমার সন্তান-সন্ততিকে তাঁর নেক কর্মসমূহকে প্রতিষ্ঠিত রাখার তৌফিক দিন আর বাংলাদেশ জামাআতকে অনুরূপ নেয়া'মুল বদল দ্বারা অনুগৃহীত করুন। আমীন।

সম্পাদক

জামাআত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

ডেস্ক নিউজ ঃ হোসনে মোবারক

আহমদীয়া কিন্ডারগার্টেন, শালশিড়ি অভিভাবকগণের (মা) কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৮ নভেম্বর ২০০৮, শালশিড়ি।

গত ১০-১১-২০০৮ ইং রোজ সোমবার সকাল ১০ টায় আহমদীয়া কিন্ডারগার্টেন, শালশিড়ির একাডেমিক ভবনে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ও তাদের মায়েদের সমন্বয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতিসহ কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, শালশিড়ির প্রেসিডেন্ট মৌলানা ইছরাইল দেওয়ান সাহেবের সভাপতিত্বে শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন অত্র কিন্ডারগার্টেনের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র শাহরিয়ার নাযিম। তার পর দোয়া হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মৌলানা হুমায়ুন কবির (মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ)। নযম পাঠ করেন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী সুইটি আক্তার।

অতঃপর মৌলবী হুমায়ুন কবির কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিক্ষার গুরুত্ব ও পিতা-মাতার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারপর খাকসার উপস্থিত অভিভাবক, পরিচালনা সদস্যবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীদের ধন্যবাদ জানান এবং সকলের উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দুর্বল, অনিয়মিত ও পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের নাম উল্লেখপূর্বক তাদের দুর্বল দিকগুলো উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনায় প্রতি ঘরে ঘরে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি উপস্থিত মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সন্তানদের প্রতি ভাল ব্যবহার, উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন এবং তাদের সাথে অশোভন আচরণ প্রদর্শন না করার জন্য মা'দের অনুরোধ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই কোমলমতি শিশুরাই একদিন উচ্চশিক্ষিত হয়ে নিজের, পরিবারের, দেশ ও তথা জাতির জন্য গৌরব অর্জন করবে (ইনশাআল্লাহ্)। আর সেজন্য তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব পিতা-মাতা, শিক্ষক এবং আমাদের সকলের। সভায় মায়েদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয় এবং তাদের অনেক গঠনমূলক মতামত গ্রহণ করা হয়। মোট ৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ৬৫ জন মাতা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন শিক্ষিকা পারভীন আক্তার।

মহিউদ্দীন আহমদ

অধ্যক্ষ

আহমদীয়া কিন্ডারগার্টেন, শালশিড়ি।

'মা' সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন আহমদ

আনসারুল্লাহ্ সংবাদ

আঞ্চলিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

২৪ নভেম্বর ২০০৮, চট্টগ্রাম রিজয়ন।

খোদা তাআলার অশেষ ফজল ও বরকতে আমরা গত ১৫-১৬ আগষ্ট ২০০৮ তারিখ ক্রোড়া, ৮ আগষ্ট ২০০৮ পাগুলিয়া, ২৬ জুলাই ২০০৮ বিষ্ণুপুর ও ১৭-১৮ জুলাই ২০০৮ দুর্গারামপুর মজলিস ও ১ আগষ্ট ২০০৮ তারিখ নেয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর জেলার ১ম আঞ্চলিক ইজতেমা করতে সমর্থ হয়েছি (আলহামদুলিল্লাহ্)। উক্ত ইজতেমা সমূহে পবিত্র কুরআন পাঠ ও কুরআন শিক্ষা প্রতিযোগিতা, তরবিয়ত ও তবলীগের গুরত্ব, নেযামের খিলাফতের আনুগত্য, নামাযের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জেলা ও মজলিসের নায়েমগণ, রিজিওনাল নায়েম সাহেব ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবগণ নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন। উক্ত ইজতেমায় প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার

প্রদানেরও ব্যবস্থা ছিল। আনসার ভাইদের উপস্থিতির সংখ্যাও ছিল সন্তোষজনক।

শফিউল আলম বরকত

রিজিওনাল নাযেম

মজলিস আনসারুল্লাহ্, চট্টগ্রাম রিজিওন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) রচিত 'নবী নেতা' পুস্তকের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

২২ নভেম্বর ২০০৮, খুলনা।

গত ২১/১১/২০০৮ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) রচিত 'নবীওকা সারদার'-এর অনুবাদ গ্রন্থ 'নবী নেতা'-এর উপর এক আলোচনা সভা খুলনার 'বায়তুর রহমান' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। নায়েব যয়ীম আলা জনাব নাসীরুদ্দীন সাহেবের সভাপতিত্বে সভা শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মুহাম্মদ ওমর আলী এবং আহাদ পাঠ করান খুলনার জেলার জেলা নাযেম জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে 'নবী নেতা' পুস্তকের উপর আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্, জনাব মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মদ ওমর আলী, জনাব মঞ্জুরুল আলম, জনাব শেখ আলী আকবর, জনাব এস, এম, আনসার উদ্দীন, জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হাই, জনাব কায়জার আলম মানিক, জনাব জাফরুল আলম ও জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। অতঃপর সভাপতি সাহেবের সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভা শেষ হয়।

মুহাম্মদ শামসুর রহমান

যয়ীম-ই-আ'লা

মজলিস আনসারুল্লাহ্ খুলনা।

তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

১৭ নভেম্বর ২০০৮, সৈয়দপুর।

গত ৩১/১০/০৮ ইং ০৪/১১/০৮ইং তারিখ পর্যন্ত মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ কর্তৃক রাজশাহী জামাআতের অধীন সৈয়দপুর হালকা মজলিসে অত্যন্ত সফলতার সাথে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। ক্লাস পরিচালনা করেন কায়েদ তরবিয়ত নও-মোবাঈন জনাব মাওলানা আলহাজ্জ আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, রিজিওনাল নাযেম ঢাকা জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী সাহেব ও সহঃ কায়েদ উমুমী মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী সাহেব প্রমুখ। শেষ দিন সেখানে আহমদীদের নিজস্ব মসজিদ প্রাঙ্গণে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ সকাল ৯:০০-১২:৩০ মি. পর্যন্ত লাজনাদের ও বিকাল৫:০০–রাত ১০:০০ পর্যন্ত আনসার, খোদ্দাম, আতফাল ও জেরে তবলীগগণের মধ্যে ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ সকালে প্রায় ৩০ জনের মত লাজনা ও বিকালে ৩০-৪০ জনের মত পুরুষ আহমদী ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন। ৩১/১০/২০০৮ তারিখ বাদ জুম্মা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সহঃ কায়েদ উমুমী জনাব মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী এর সভাপতিত্বে ক্লাস শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে বাকী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ও রাজশাহী জামাআতের প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল হোসেন ও জেলা নাযেম রাজশাহী জনাব আতাউর রহমান সাহেব বিভিন্ন সময়ে ক্লাস নেন ও নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন। উক্ত ক্লাসে ৬ জন নন-আহমদী জামাআতে দাখিল হন (আলহামদুলিল্লাহ্)।

শাহ আজিজুর রহমান

যয়ীমে আলা

মজলিস আনসারুল্লাহ্ রাজশাহী।

তালিম তরবিয়তী সভা

৮ নভেম্বর ২০০৮ ক্রোড়া

গত ৭/১১/২০০৮ইং তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ক্রোড়ার উদ্যোগে বাদ মাগরিব স্থানীয় মসজিদে জনাব গাজী মাজহারুল খোকন প্রেসিডেন্ট ক্রোড়া এর সভাপতিত্বে তালিম ও তরবীয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)। উক্ত সভায় কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন জনাব যুবায়ের আহমদ এবং জনাব তৌসিফ আহমদ। তারপর সভায় মালি কুরবানীর গুরুত্বের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন জনাব মারূফুর রহমান এবং জনাব এনামুল হক। পরিশেষে সভাপতি সাহেব গুরুত্বপুর্ণ ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়ার পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিল সন্তোষজনক।

এনামুল হক

জি. এস. (ক্রোড়া)।

শুভ বিবাহ

• গত ২৪-১০-২০০৮ইং মোছাঃ সৈয়দা সুলতানা, পিতা-সৈয়দ ইব্রাহীম সিকদার, ৮৪, এস এস, খালেদ রোড, জামালখান, চট্টগ্রাম এর সাথে মোহাম্মদ জাকির হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, সাগরপড়া, ঘোড়ামারা, রাজশাহী এর বিবাহ ৮০,০০০/– (আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৪২/০৮

• গত ২৯-১০-২০০৮ইং মোছাঃ জান্নাতুল ফির্দৌস শিরীন পিতা-মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, শালশিড়ি, ফুলতলা হাট, বোদা পঞ্চগড় এর সাথে মোহাম্মদ জাকির হোসেন পিতা-মোহাম্মদ আবেদ আলী মোল্লা তেবাড়িয়া, নাটোর এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৪৩/০৮

• গত ০৬-১১-২০০৮ইং মোছাঃ নুসরত জাহান, পিতা-মোহাম্মদ জিয়াউল হক, আহমদনগর, পঞ্চগড় এর সাথে মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ মোজহারুল ইসলাম, বসন্তপুর, শ্যামপুর এর বিবাহ ১,০০,০০০/-(একলক্ষ)টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৪৪/০৮

এ পক্ষের কৃষি
১৬ ডিসেম্বর হতে ৩১ ডিসেম্বর
১ পৌষ হতে ১৫ পৌষ

চাষী ভাই এপক্ষে নিম্নবর্ণিত কাজগুলি করতে পারেন ঃ

১) আমন চাষ ঃ এপক্ষে দেশের দক্ষিণ অঞ্চল বাদে সকল অঞ্চলের আমন কাটা শেষ হয়ে যাবে। আমন কাটার পর জমিতে ৩/৪ টি চাষ ও মই দিয়ে রাখবেন। এতে জমি ফাটবে না এবং বোরো চাষে পানির অপচয় কম হবে।

ক) দক্ষিণ অঞ্চলে এপক্ষেও আমন কাটা চলবে। বোরো চাষের সুযোগ সুবিধা না থাকায় আমন কাটার পর প্রায় সম্পূর্ণ জমি দীর্ঘ সময় অনাবাদী থাকে। জমিকে সুষ্টভবে ব্যবহারের জন্য আমন কাটার পর আউস চাসের পূর্বে আর একটি ফসল ফলানোর জন্য জমির উপযুক্ততানুসারে কোন্ জমিতে কোন্ ফসল চাষ করবেন তার পরিকল্পনা এখনই গ্রহণ করুন। আপনি ইচ্ছা করলে নিম্ন প্রদত্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন।

নদী/খাল পাড়ের বেলে দো-আঁশ, এবং দো-আঁশ মাটিতে ফুটি/ তরমুজ/ মরিচ/ধনে/মিষ্টি কুমড়ার চাষ করতে পারেন। এজন্য আপনি এখনই জমি চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরী করুন। সুষম মাত্রায় সার দিয়ে বীজ বপন/চারা রোপন করুন।

নদী/খাল থেকে একটু ভিতরের জমিতে গিমা/ভুঁই কুমড়া এবং মুগ ডাল চাষ করতে পারেন।

চাষী ভাই দক্ষিণ অঞ্চলে রবি মৌসুম অনেক দেরীতে শুরু হয় এবং তাড়াতাড়ি চলে যায়। ফলে সব্জির উৎপাদন ব্যহত হয়। তাই সব্জির অভাব লেগেই থকে। আপনি আগাম খরিফ সব্জির চাষ করে সব্জির অভাব দূর করার সাথে সাথে আর্থিক ভাবে লাভবান হতে পারেন। এ জন্য সেচের সুযোগ আছে যেমন পুকুর ধারের/খাল পাড়ের জমি আপনি নির্বাচন করতে পারেন। তবে সব জমিই আমন কাটার পর ৩/৪ টি চাষ ও মই দিয়ে রাখবেন।

২) ভূট্টা চাষ ঃ চাষী ভাই বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিন পর ভূট্টা গাছে ১০-১২ টি পূর্ণ পাতা হবে। এসময় আর একবার আগাছা পরিস্কার করুন, ২য় সেচ দিন এবং ইউরিয়া সারের ২ কিস্তি উপরি প্রয়োগ করুন। গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। গাছে রোগ দেখা দিলে দমনের ব্যবস্থা নিন। প্রয়োজনে খাকসার/উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিন।

৩) গোল আলু চাষ ঃ আলু খেত প্রতি দিন পরিদর্শন করুন। বীজ বপনের ২০ দিন পর্যন্ত মাটির রস বুঝে পরিমিত সেচ দিন। ২০-২৫ দিনর মধ্যে টিউবার/আলু গঠন শুরু হবে। এসময়ে ১ম সেচ দিন। মাটিতে জো আসলে অর্থাৎ বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে আগাছা পরিষ্কার করুন। নালায় সার উপরি প্রয়োগ করুন। কোন অবস্থায় সরাসরি গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ করা যাবে না। গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন, দুই সারির মাঝখানে সেচনালা তৈরী করুন। বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে ২য় সেচ দিন। নালার ২/৩ অংশ ডুবিয়ে সেচ দিন। নালা সম্পূর্ণ ডুবিয়ে সেচ দিলে গাছের কান্ড এবং পাতা ডুবে যাবে। ফলে মড়ক রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

৪) মিষ্টি কুমড়ার চাষ ঃ এপক্ষে মিষ্টি কুমড়া চাষ করুন। চাষের জন্য দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করুন। জমিতে উত্তম ভাবে চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করুন। শেষ চাষে প্রতিশতাংশে পঁচা গোবর ২০ কেজি/কম্পোস্ট এবং ২০০ গ্রাম টিএসপি সার সমস্ত জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিন। মই দিয়ে মাটি সমান করুন। ৩০০ সে:মি: অন্তর অন্তর ২০০ সে: মি: পর পর ৪৫ সে:মি: ৪৫ সে: মি: ৪৫ সে: মি: আকারের মাদা তৈরী করুন। প্রতি মাদায় ২০০ গ্রাম পঁচা গোবর/কম্পোস্ট মাটির সাথে মিশিয়ে মাদা ভর্তি করে দিন। এরপর সেচ দিয়ে খেত ভিজিয়ে দিন। মাটিতে জো আসলে প্রতি মাদায় ৩/৪ টি করে বীজ বপন করে দিন। চারা গজালে প্রতিমাদায় সুস্থ সবল ২টি করে গাছ রেখে বাকী গাছ সাবধানে তুলে ফেলুন। এরপর ৩ কিস্তিতে প্রতি মাদায় প্রতিবার ইউরিয়া ৩০ গ্রাম এবং এমওপি-৩০ গ্রাম গাছের চার পাশে রিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করুন। ২ সারির মাঝখানে সেচনালা তৈরী করুন এবং সেচনালায় সেচ দিন।

৫) ডাল ফসল ঃ ডাল ফসলে অন্তরবর্তীকালিন পরিচর্যা করুন। আগাছা পরিস্কার করুন। এপক্ষের শেষ দিকে জাব পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রথম দিকে দমনের ব্যবস্থা নিন।

৬) আখ চাষ ঃ আপনার খেতের আখের চারার ৪/৫ টি পাতা হলে নালায় ১ম উপরি প্রয়োগ করুন। আর ১০/১২টি পাতা হলে ২য় উপরি প্রয়োগ করুন এবং প্রতিবার উপরি প্রয়োগের পর নালায় হালকা মাটি দিয়ে সার ঢেকে দিন।

৭) চিনাবাদাম চাষ ঃ এপক্ষকালে অন্তরবর্তীকালিন পরিচর্যা করুন। আগাছা পরিষ্কার করুন।

খেতের উপরের স্তরের মাটি আলগা করে দিন। মনে রাখবেন গাছের ফুল ফোটার পূর্বেই গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

৮) বোরো চাষ ঃ এপক্ষকালে রোরো চারা রোপন শুরু করতে পারেন। চারা রোপনের পূর্বে জমি চাষ ও মই দিয়ে উত্তম রূপে প্রস্তুত করুন। শেষ চাষে ইউরিয়া সার বাদে বাকী সার নিম্নোক্ত হারে প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করুন। প্রয়োজনে খাকসার/উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিন।

জৈব সার ঃ	২০০ কেজি/একর
ইউরিয়া ঃ	৯৬ কেজি/একর
টিএসটি ঃ	৫০ কেজি/একর
এমওপি ঃ	৩৬ কেজি/একর
জিপসাম ঃ	২৪ কেজি/একর
দস্তা ঃ	০২ কেজি/একর

৯) গম চাষ ঃ এ পক্ষকালে যে সকল জমির ফসলের বয়স ১৭ দিন হবে। সেসব জমিতে ১ম সেচ দিন এবং প্রথম উপরি প্রয়োগ করুন। জমিতে জো আসলে মাটির চট ভেঙ্গে দিন এবং আগাছা পরিষ্কার করুন। আর যেসকল জমির ফসলের বয়স ৩০/৩৫ দিন হবে সে সকল জমিতে ২য় কিস্তি উপরি প্রয়োগ করুন।

১০) শীতকালিন সব্জি চাষ ঃ

(ক) টমেটো চাষ ঃ চাষী ভাই এপক্ষকালেও টমেটো চাষ করতে পারেন। যে সকল খেতের গাছের বয়স ২৫-৩০ দিন হয়েছে সে সকল খেতের গাছে ঠেকনাদিন। রিং পদ্ধতিতে সার উপরি প্রয়োগ করুন। জমিতে রস কম থাকলে সেচ দিন। জো আসলে মাটি আলগা করে দিন। অবাঞ্চিত শাখা ছাটাই করুন।

(খ) বাঁধা কপি, নাবি জাতের কপি এ পক্ষকালেও রোপন করতে পারেন। ভাল ফলনের জন্য চারা রোপনের ২০-৩০ দিন পর পর ২/৩ টি সেচ দিন। চারা রোপনের ১০, ৩০ ও ৫০ দিন এবং মাথা বাঁধার সময় মোট তিনবার ইউরিয়া এবং এমপি সার রিং পদ্ধতিতে উপরি প্রয়োগ করুন।

গ) ফুলকপি ঃ চাষী ভাই চারা রোপনের ১০, ৩০ ও ৫০ দিন পর ১ম, ২য় এবং ৩য় কিস্তি উপরি প্রয়োগ করুন। গাছের নিবিড় যত্ন নিন। আগাছা দমন করুন। সেচ দিন। মাটির আস্তরন ভেঙ্গে ঝুরঝুরে করে দিন। ফুল আসা শুরু হলে চারদিকে পাতা দিয়ে ঢেকে দিন।

এপক্ষে অন্যান্য শীতকালীন সব্জির নিবিড় যত্ন নিন। সঠিক সময়ে ফসল তুলুন এবং বিপণন করুন।

একজন সফল বীজের ব্যবসায়ী

আপনি কি শিক্ষিত যুবক। আপনি কি স্বকর্মসংস্থানে আগ্রহী। আপনি কি যে কোন কাজ নিঃসঙ্কোচে করতে পারেন। আপনি কি কষ্ট সহ্য করতে পারেন। তাহলে আপনি বীজের ব্যবসা শুরু করতে পারেন এবং একজন সফল বীজের ব্যবসায়ী হতে পারবেন।

কেন আপনি বীজের ব্যবসা করবেন ঃ

বীজ হলো কৃষির প্রধান উপকরণ। বীজ ছাড়া কোন ফসল উৎপাদন চিন্তা করা যায় না। বর্তমানে কৃষিতে বিপ্লব এসেছে উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করে। তাই কৃষিতে লাভবান হতে হলে বীজ ব্যবহারের বিকল্প নাই। আপনিও গুণগতমানের বীজের ব্যবসা করে নিজে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন সাথে সাথে দেশের ফসল উৎপাদনের অবদান রাখতে পারেন। সর্বোপরি বীজের ব্যবসা হলো ভদ্র লোকের ব্যবসা।

বীজ ব্যবসার ভবিষ্যৎ কি :

বাংলাদেশে বাৎসরিক বিভিন্ন ফসলের গুণগত মানের সর্বমোট **১১৬২৬১** মে: টন বীজের প্রয়োজন। এর মধ্যে বর্তমানে বিএডিসি, ডি এই এবং প্রাইভেট কোম্পানী মিলে সরবরাহ করছে ২১০৯৭০ মে: টন। অর্থাৎ মোট চাহিদার মাত্র ১৮%। বাকী ৮২% নিম্নমানের বীজ ব্যবহৃত হচ্ছে। চাষী দিন দিন গুণগত মানের বীজ ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছে। তাই এ ব্যবসার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

বীজের ব্যবসা শুরু করার প্রধান শর্ত কি;

বীজ বিধিমালা–২০০৭ অনুসারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধ ছাড়া বীজের ব্যবসা করা যাবে না। বীজের ব্যবসার জন্য মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।

কিভাবে মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন পাবেন ঃ

এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য খাকসারের সাথে অথবা বহিরাঙ্গন কর্মকর্তা, এসসিএ, অথবা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

৫) কিভাবে ব্যবসা শুরু করবেন ঃ

(ক) প্রথমে অল্প পুজি দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানীর প্যাকেটকৃত বীজ বিপণন করার মাধ্যমে দিয়ে ব্যবসা শুরু করবেন।

(খ) বীজের ব্যবসা শুরু করার জন্য আপনাকে যে কোন বাজারে একটি ঘর/বিক্রয় কেন্দ্র থাকতে হবে।

(গ) বড় শহর হলে যেখানে আরো বীজের দোকান আছে তার আশে পাশে বিক্রয় কেন্দ্র হলে ভাল হবে। (ঘ) ছোট শহর অথবা বাজার হলে; যেস্থানে লোকের সমাগম বেশী হয় এরকম স্থানে বিক্রয় কেন্দ্র নিতে হবে।

(ঙ) বিএডিসি থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারলে ভাল হবে। আপনার বৃহত্তর জেলার উপ-পরিচালক (বীজ বিপণন) বিএডিসি এর দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

(চ) দেশে বর্তমানে অনেক বড় বড় বীজ কোম্পানী বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিপণন করছে। এসকল কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্ট হলে ভালো করবেন।

(ছ) কখনও নিম্নমানের বীজ বিপণন করবেন না এবং ব্যবসায় বিশ্বস্থতা নষ্ট করা যাবে না।

৬) বীজ কোথায় পাবেন ঃ

(ক) বিএডিসির লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারলে বিএডিসি থেকে বীজ পাবেন।

(খ) বিভিন্ন কোম্পানী থেকে বীজ সংগ্রহ করতে পারবেন।

(গ) ঢাকার সিদ্দিক বাজার থেকে বিভিন্ন কোম্পানীর বীজ এবং আমদানিকৃত বীজ সংগ্রহ করতে পারবেন।

৮) বীজের সাথে আর কিসের ব্যবসা করা যায় ঃ

যেকোন কৃষি উপকরণের ব্যবসা করতে পারেন। বিশেষ করে কীটনাশকের ব্যবসা করতে পারেন। এজন্য আপনাকে লাইসেন্স করতে হবে।

৯) কীটনাশক বিপণনের লাইসেন্স কোথায় পাবেন ঃ

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সুপারিশ নিয়ে উপ-পরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ) দপ্তর থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারবেন।

আপনি কি উদ্যমি যুবক। তাহলে আপনি বীজের ব্যবসা করার মনস্থীর করুন। আপনি সফলকাম হবেন।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরা'য়াত,
আহমদীয়া মুসলিম জামাআত,
বাংলাদেশ।